পেতাম যদি
এমন শাসক
আবুল হোসাইন মাহমুদ

পেতাম যদি এমন শাসক

আবুল হোসাইন মাহমুদ

মুনীরা প্রকাশনী, ঢাকা

পেতাম যদি এমন শাসক : আবুল হোসাইন মাহমুদ
প্রকাশক : আবদুর রাজ্জাক, মুনীরা প্রকাশনী
১৭৪/এ তেজকুনীপাড়া, ঢাকা-১২১৫
গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক
প্রকাশকাল : জানুয়ারি, ২০০২ইং; শাওয়াল, ১৪২২ হিজরী
কম্পিউটার কম্পোজ : রহমত কম্পিউটার্স
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা, হ্যালো : ০১৭৪৪৫৭০২
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : আবুল হোসাইন মাহমুদ
কালারটোন গ্রাফিক্স এন্ড এনিমেশন, ৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা
মুদ্রণ : তাকওয়া প্রেস

মূল্য : পঞ্চাশ টাকা

Petam Jodi Amon Shashok
Written by : Abul Hossain Mahmud
Published by : Abdur Razzaque
Munira Prokashoni
First Published : January 2002
Price – Taka 50 Only

নজরানা

যিনি নিত্যদিনের কাজের সাথে
আমার লেখার কাজটিকেও গেঁথে দেন,
স্মরণ করিয়ে দেন প্রতিদিন
সেই প্রিয়তমা
জীবনসঙ্গিনীকে

লেখকের অন্যান্য সাহিত্যকর্ম

বই

১. আল-কোরআনের কাহিনী–১
২. আল-কোরআনের কাহিনী–২
৩. আল-কোরআনের কাহিনী–৩
৪. ভালো মানুষের গল্প
৫. আমার এ গান তোমার জন্য–১
৬. আমার এ গান তোমার জন্য–২
৭. নতুন দিনের ছড়া
৮. ফুল পাখিদের দেশে
৯. বর্ণমালার ছড়া
১০. ন্যায় বিচারের গল্প
১১. মুসলিম বীরদের গল্প
১২. গযব নামে ঢলের মতো

নাটক

১. চরম শাস্তি
২. মহাপ্লাবন
৩. ঈসা খাঁর তলোয়ার
৪. সংগ্রামী কাফেলা
৫. পরবেছার সাবের আসর–১
৬. পরবেছার সাবের আসর–২
৭. ভালো হয়ে যাও
৮. মুক্তর

গান

১. শুধু তার ভালোবাসায়
২. স্বপ্ন সফল করো
৩. নয়া দিনের গান

মুনীরা প্রকাশনীর অন্যান্য বই

অন্ধকারের ভয়াবহতা থেকে বাঁচতে মানুষ আলো চায়। ঝলমলে আলো। সেই ঝলমলে, উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছেন অনেক মহামানব। কেউ স্রষ্টার পরিকল্পিত মশালধারী। আবার কেউ মশালধারীর আলোকে আলোকিত। যাঁরা সত্য সুন্দরের জয়গান করেছেন জীবনভর। ক্ষমতার স্বর্ণশিখরে থেকেও ন্যায়-নীতির বাইরে এঁরা পা বাড়াননি। এঁরাই পৃথিবীকে করেছেন আলোকিত। এঁদের শাসনে মানুষ পেয়েছে ভালোবাসা। পেয়েছে শান্তি, অনাবিল সুখ আর সমৃদ্ধি।

আজ ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে সেই আলোকিত শাসকদের বড় প্রয়োজন। এই গ্রন্থে রয়েছে সেই আলোকিত শাসকদের খণ্ড খণ্ড মন মাতানো কাহিনী— যা রাষ্ট্রের শাসকদেরই শুধু নয়, সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের শাসকদের জন্য রয়েছে পরিপূর্ণ হেদায়েত। আর সবার জন্য তো শিক্ষার ব্যাপারটি রয়েছেই। ছোট-বড় সবারই ভালো লাগবে বলে আমার বিশ্বাস।

মিরপুর, ঢাকা
২৮শে এপ্রিল
১৯৯৮ইং

আবুল হোসাইন মাহমুদ

সূচিপত্র

বিস্ময়ে হতবাক ০৭
কাঁধে নিলেন বোঝা ০৯
শাস্তি আর শাস্তি ১২
স্বনির্ভর হওয়া উচিত ১৭
সংসার নয় দায়িত্ব বড় ১৯
দুধ দোহাবেন খলীফা ২১
চিনি ফিরিয়ে দিলেন ২৩
পরকালের ভয় ২৬
গোপনে কাজ করেন ২৯
একবার তুমি একবার আমি ৩১
লাভের টাকা বাইতুলমাল ৩৫
নিজের জন্য করে না কিছুই ৩৭
লিখে দিন দাবী নেই ৩৯
মধু খাওয়া হলো না ৪১
তলোয়ারেই সোজা করে দেবে ৪৩
এ কাপড় দু'জনের ৪৫
নিশিরাতে প্রজার পাশে ৪৭
আপনিই আমাকে মাফ করে দিন ৫১
মোমবাতিটা সরকারী ৫৫
মুগ্ধ পথিক ৫৭
বৃদ্ধের ভাতা ৫৯
দোষ তো আমার ৬১
আপেল কাড়া বাপ ৬৪
খলীফার ভাঙ্গা ঘর ৬৮
আমাকে বাঁচাতে চান না? ৭১
খেদমতগার ৭৩
দরিদ্র এক বাদশা ৭৫
সোনার গাঁর সোনার মানুষ ৭৭

বিস্ময়ে হতবাক

ইসলামের শ্রেষ্ঠ নবী রাসূল মুহাম্মদ (সা)। তিনি শুধু নবীই ছিলেন না। ছিলেন শ্রেষ্ঠ শাসক। মানুষকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। সেবা করতেন। মানুষের কল্যাণ করাই ছিল তাঁর প্রধান কাজ। অথচ তিনি যখন নবুয়ত লাভ করেন, তখন মক্কাবাসীরা তাকে কম অত্যাচার করেনি। বার বার তিনি বাধা প্রাপ্ত হয়েছেন সত্যের পথে মানুষকে আনতে গিয়ে। তাঁর উপর হামলা হয়েছে বহুবার। মক্কাবাসীদের অত্যাচারে টিকতে না পেরে স্বীয় জন্ম ভূমি ছেড়ে মদীনায় আশ্রয় নিতে হয়েছিল তাকে।

নবুয়তের একুশ বছর পরের কথা। রাসূল (সা) দশ হাজার সাহাবী নিয়ে মক্কা বিজয়ের জন্য রওয়ানা হন।

মুসলিম বাহিনী মক্কায় প্রবেশ করলো। ভীত সন্ত্রস্ত মক্কাবাসীরা ভাবলো এবার নবী মুহাম্মদ (সা) প্রতিশোধ নেবে। কেউই হয়তো রক্ষা পাবে না। এই মক্কাবাসীরা তো রাসূলকে তেরটি বছর নানা অত্যাচারে জর্জরিত

করেছিল। সে লোকটির হাতের মুঠোয় আজ সারা মক্কাবাসী। আজ তো তারই প্রতিশোধ নেয়ার দিন। কারণ আজ তিনি মদীনার শাসক।

মক্কাবাসীরা ভয়ে থর থর করে কাঁপছে। কেউ রাসূলের বাহিনীর গতিরোধ করার সাহস পেলো না। তারা ভাবলো এই বুঝি নবী মুহাম্মদের বাহিনী আমাদের উপর প্রতিশোধ নিতে আসছে।

কিন্তু না।

প্রেমের নবী, দয়ার নবীর মনে ছিল অন্য কিছু।

মক্কাবাসীর ধারণাকে সম্পূর্ণ পাল্টে দিলেন তিনি।

তিনি ঘোষণা করলেন সাধারণ ক্ষমা।

মক্কাবাসীরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল।

তাঁকে আমরা কতনা কষ্ট দিয়েছি। অথচ আজ তিনি আমাদের উপর প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

সত্যিই তিনি মহান নবী।

রাসূলের আহ্বানে আলোর পতাকা হাতে নিলো তারা।

মনের গহীনে গেঁথে নিলো সত্যের অসীম বাণী।

সেদিন যেমন বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিল মক্কাবাসী তেমনি বিস্মিত হয়েছে পৃথিবীর তামাম মানুষ। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ক্ষমার নজীর কি আর কোথাও আছে?

কাঁধে নিলেন বোঝা

মক্কা বিজয়ের পরের ঘটনা।

মক্কায় তখন শান্তির পতাকা পতপত করে উড়ছে।

সবার মনেই খুশির জোয়ার।

স্বজনহারা মানুষেরা আবার তাদের স্বজনদের ফিরে পেয়েছে। ভিটে মাটি ছাড়া মানুষেরা পেয়েছে তাদের আবাস ভূমি। খুশি হবারই তো কথা।

প্রিয় নবীর মনেও আনন্দের ফোয়ারা বইছে।

একদিন তিনি ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন এলাকা দেখছেন। মানুষের খোঁজ-খবর নিচ্ছেন। হাটতে হাটতে তিনি একটা খোলা জায়গায় এসে পড়লেন।

সামনে একটি গাছ।

ঐ গাছ তলায় বসে এক বুড়ি কাঁদছে।

বয়স সত্তর-আশি হবে। বয়সের ভারে কুঁজো হয়ে গেছে সেই বুড়ি।

পাশে পুটলা পাটলি নিয়ে এক বোঝা।

বুড়ি মরুভূমির গরমে ঘামছে। তার শরীর খুবই ক্লান্ত। বুড়ি কাঁদছে আর কাকে যেন বকছে। আবার তার মধ্যে কিছুটা ভয়ের ছাপও রয়েছে।

রাসূল (সা) তার কাছে গেলেন। বুড়ির অবস্থা দেখে তাঁর খুব কষ্ট হলো। তিনি বুড়িকে বললেন—

ঃ বুড়ি মা! আপনার কিসের দুঃখ। আপনার দুঃখের কথা আমার কাছে বলুন। আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি?

বুড়ি নবীজিকে চিনতে পারেনি। তাই সে নবীজির গোষ্ঠী উদ্ধার করে গালাগাল করতে লাগলো। বললো—

ঃ আর বলো না বাবা! মুহাম্মদ নামে এক নবী নাকি এসেছে। ও আমাদেরকে বাপদাদার ধর্ম ত্যাগ করতে বলছে। আজে-বাজে কথা বলে বেড়াচ্ছে। ও একটা ভণ্ড। ধোঁকাবাজ। ওর কথা শুনো না। আমরা আমাদের ধর্ম বাঁচাতে দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আমার সাথীরা দূরে চলে গেছে। আমি বাবা বুড়ো মানুষ। এই মালপত্র নিয়ে ওদের সাথে কুলাতে পারছি না।

ঃ ওরা কোথায়?

ঃ হয়তো ঐ দূরের পাহাড়ে চলে গেছে।

ঃ ঠিক আছে। চলুন আমি আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। আপনার বোঝাটি আমার কাঁধে দিন।

বলে রাসূল (সা) বুড়ির বোঝাটি নিজের কাঁধে তুলে হাঁটতে শুরু করলেন। বুড়িও মনের আনন্দে নবীজির পেছন পেছন হাঁটা শুরু করলো।

বেশ কতক্ষণ হেঁটে তিনি বুড়ির সাথীদের কাছে গিয়ে পৌঁছুলেন।

বুড়ির সাথীরা তো বুড়ির সাহায্যকারীকে দেখে অবাক।

যার ভয়ে তারা পালিয়ে এসেছে সে-ই তাদের সামনে।

যাকে তারা গালিগালাজ করেছে সেই আজ তাদের সাহায্যকারী হয়ে এসেছে।

বুড়ির সাথীরা আরো ভীষণ অবাক হলো। এটা কি করে সম্ভব! যে নাকি এখন আরবের রাজা। সে বুড়ির এ বোঝা কাঁধে নিয়েছে! আমরা তো তার শত্রু। আর সেই রাজা শত্রুকে সাহায্য করছে!

তাদের মধ্যে ভাবনা এলো।

তাহলে কি এই মুহাম্মদ সত্য নবী?

তাহলে কি এই মুহাম্মদ মহান?

বুড়িও যখন বুঝতে পারলো তার সাহায্যকারী স্বয়ং মুহাম্মদ। তখন বিস্ময়ে তার চোখ ছানাবড়া হয়ে গিয়েছিল।

আর নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছিল। ছিঃ আমি এমন একটা মানুষকে গালিগালাজ করলাম। যাকে শত্রু ভেবে চলে এসেছিলাম।

তিনিই আজ বন্ধুর মত আচরণ করেছেন।

যিনি বন্ধুর মত আচরণ করেন তিনি কখনো শত্রু হতে পারেন না।

তারা সবাই মিলে রাসূলের কাছে ক্ষমা চাইলো। আর বললো–

ঃ মুহাম্মদ আমাদের ভাই। আমাদের বন্ধু। আমরা তাঁর কথা শুনবো। আর তাঁর পথে চলবো।

এই হলো আর্দশ শাসকের নমুনা। যিনি মহানুভবতা দিয়ে সবার মন জয় করেছিলেন।

শান্তি আর শান্তি

তোমরা যে আরব দেশের নাম জানো, সেই আরব দেশের মানুষ ইসলাম আসার আগে নানা গোত্রে বিভক্ত ছিল। ঐ সব গোত্রের যারা নেতা ছিল তাদেরকে সবাই মেনে চলতো। ভক্তি-শ্রদ্ধা করতো। আর তারা বাস করতো স্বাধীনভাবে।

এমনই এক গোত্রের নাম ছিল তাই গোত্র। ইয়ামান দেশের অধিবাসী ছিল তারা। সবাই এ গোত্রকে চিনে।

হাতেম তাই ছিলেন ঐ গোত্রের নেতা। তিনি খুবই ভালো লোক ছিলেন। তিনি ছিলেন দানশীল এবং মহৎ। এই হাতেম তাইয়ের দানশীলতার কথা সারা পৃথিবীর মানুষ জানে। তোমরাও নিশ্চয় শুনেছো এই বিখ্যাত হাতেম তাইয়ের কথা।

একদিন হাতেম তাইয়ের জীবন প্রদীপ নিভে গেলো। তিনি পাড়ি জমালেন পরপাড়ে। তার অবর্তমানে তার ছেলে আদী হলেন তাই গোত্রের

নেতা। তিনি নেতা হয়ে লোকজনের উপর বেশী মাত্রায় করের বোঝা চাপিয়ে দিলেন।

আদী ছিলেন খ্রিষ্ট ধর্মের লোক। আর তার গোত্রের লোকেরা ছিল মূর্তি পূজক। তারা নেতা আদীর উপর কিছুটা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেলো।

ঠিক এই সময়ে আরবে নবী মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাব ঘটে।

তিনি ইসলাম প্রচার শুরু করেন।

ইসল্যামের আলো এক সময় ইয়ামানেও গিয়ে পৌঁছুল।

আরবের অন্যদের মত তাই গোত্রের লোকেরাও ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হলো। আর বিরোধীতা শুরু করলো আদীর শাসনের।

আদি ছিলেন বুদ্ধিমান লোক। তিনি বুঝতে পারলেন ইসলামের বিজয় একদিন ইয়ামানেও এসে পৌঁছবে। তাই তিনি সময় থাকতেই সবকিছু গোছালেন। তারপর একদিন তিনি পালিয়ে গেলেন দামেস্কে।

এর পরের ঘটনা।

এক সময় মুসলমানদের সাথে তাই গোত্রের যুদ্ধ হলো।

যুদ্ধে জয়ী হলো মুসলমানরা।

আর তাই গোত্রের অনেক নারী-পুরুষ বন্দী হলো।

বন্দীদের মধ্যে আদীর বোন সাফিনাও ছিল।

এক সময় যুদ্ধ বন্দীদের মদীনায় আনা হলো।

একদিন মহানবী (সা) বন্দীখানায় বন্দীদের দেখতে গেলেন। সুযোগ পেয়ে আদীর বোন সাফিনাও রাসূল (সা)-এর কাছে এক আবদার করে বসলো। কারণ আদীর মত সেও ছিল বুদ্ধিমতী।

সাফিনা প্রিয় নবী (সা)-এর কছে নিবেদন করলো—

ঃ হযরত আমি একজন ভদ্রঘরের মহিলা। আদী ইবনে হাতেম আমার ভাই। সে আমাকে ফেলে দামেস্কে চলে গেছে। দয়া করে আমাকে তার কাছে পাঠিয়ে দিন।

নবীজী অবাক হয়ে বললেন—

ঃ কি খ্যাতিমান হাতেম তাইয়ের পুত্র তোমার ভাই! অথচ সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছ থেকে পালিয়ে গেল!

ঃ হুজুর, এ দুনিয়ায় আমার আর কেউ নেই। একমাত্র ভাই-ই আমার অভিভাবক। হুজুর দয়া করুন। বললো সাফিনা কাকুতি ভরে।

দয়ার সাগর নবীজীর মনে সাফিনার জন্য মায়া জেগে উঠলো। তিনি বললেন–

ঃ ঠিক আছে। তোমাদের গোত্রের কেউ মদীনায় এলে তার সাথে তোমাকে পাঠিয়ে দেবো।

কিছুদিন পর কিছু লোকের সন্ধান পাওয়া গেল যারা সিরিয়ায় যাচ্ছে। আর তারা তাই গোত্রের লোক। প্রিয়নবী হাতেম তাইয়ের মেয়ে সাফিনাকে খুবই যত্নের সাথে ঐ লোকজনের সাথে তার ভাই আদীর কাছে দামেস্কে পাঠিয়ে দিলেন। তাকে নবীজী নতুন কাপড় ও টাকা পয়সাও দিলেন।

দামেস্কে পৌঁছে সাফিনা তার ভাইয়ের সাথে দেখা করলো। তাকে ফেলে আসার জন্য তার ভাইকে তিরস্কার করলো।

বোনের কথা শুনে আদী খুবই লজ্জিত হলেন এবং বোনের কাছে ক্ষমা চাইলেন।

বন্দী সাফিনার সাথে রাসূল (সা)-এর ভালো আচরণের কথা শুনে আদী অবাক হলেন। তিনি ভেবেছিলেন নবীজী তার বোনকে অপমান করবে। কিন্তু তার বোন নিজেই নবীজীর প্রশংসা করলো। সে আদীকে বললো নবীজীর কাছে তোমার যাওয়া দরকার। যদি তিনি সত্যিই আল্লাহর নবী হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর কাছে তোমার আত্মসমর্পন করাই কল্যাণকর হবে। আর যদি তিনি আল্লাহর নবী না হন তাহলে তাঁর আচরণেই তা প্রকাশ পাবে।

একদিন আদী নবীজীর সাথে দেখা করার জন্য মদীনায় এলেন। মসজিদে নববীতে গিয়ে নবীজীর সাথে দেখা করলেন।

মহানবী তাকে খুবই আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করলেন। কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা হলো। এরপর নবীজী তাকে নিয়ে নিজের ঘরের দিকে রওনা হলেন। পথে এক কুৎসিত মহিলা নবীজীর পথ রুখে দাঁড়ালো। আর নানা ধরনের প্রশ্ন করতে লাগলো।

মহানবী কোনরূপ বিরক্ত হলেন না। বরং শান্তভাবে মহিলার সব কথা শুনলেন। তারপর ধীরে ধীরে মহিলার সেসব প্রশ্নের জবাব দিলেন।

আদী মনে মনে ভাবলেন এ ধরণের আচরণ শুধুমাত্র নবীদেরই হতে পারে। সাধারণ কোন লোক এরকম ধৈর্য ও আন্তরিকতার সঙ্গে মহিলার এতসব প্রশ্নের জবাব দিত না।

প্রিয় নবী আদীকে নিয়ে তাঁর ঘরে পৌঁছুলেন। ঘর দেখেই আদী বুঝতে পারলেন অতি সাধারণ জীবন-যাপন করেন মহানবী। তাঁর ঘরে একটি মাত্র চাদর। তা-ই বিছিয়ে দিলেন আদীকে বসার জন্য। আর নিজে বসলেন মাটিতে।

আদী ভাবলেন যে লোকের এমন সাধারণ চালচলন, তিনি নবী না হয়ে পারেন না।

বসার পর প্রথমে কথা বললেন নবীজী। বললেন–

ঃ তোমার ধর্ম তো খ্রীষ্ট ধর্ম ছিল,তাই না?

ঃ জী। জবাব দিলেন আদী।

ঃ তা হলে তোমার প্রজাদের উপর তাদের আয়ের এক চর্তুথাংশ কর ধার্য করলে কিভাবে? খ্রীষ্ট ধর্মে কি এটা অন্যায় নয়?

অবাক হলেন আদী নবীজীর কথা শুনে। কারণ তার খ্রিষ্টান হওয়ার কথা তো কেউ জানে না। আত্মীয়দের কাউকেও তিনি তা কখনো বলেননি। নবীজী কি করে জানলেন আমি খ্রিষ্টান? নিশ্চয় তিনি আল্লাহর নবী, সত্যিকারের নবী।

ইনি যে আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী, এ বিশ্বাস আদীর মনে দৃঢ়ভাবে জন্মালো। তিনি সানন্দে নবীজীর হাতে হাত রেখে মহান ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করলেন।

একদিন মহানবী কথায় কথায় আদীকে বললেন–

ঃ তুমি এখন মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশা দেখতে পাচ্ছো। মুসলমানরা বহু কষ্টে দিনাতিপাত করছে। চারিদিকে তাদের শত্রু। তাদের জানমালের কোন নিরাপত্তা নেই। কিন্তু সেদিন বেশী দূরে নয় যেদিন মুসলমানরা এত সম্পদের মালিক হবে যে, তাদের মধ্যে কোন দরিদ্র লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তাদের সকল শত্রু পরাজিত ও নিশ্চিহ্ন হবে। সবখানে বিরাজ করবে অনাবিল শান্তি। একা এক নারী ইরাক থেকে হেজাজে ভ্রমণ করতে পারবে। অচিরেই দেখতে পাবে বেবিলনের প্রাসাদসমূহ মুসলমানদের হস্তগত হবে।

মহানবীর ইন্তেকালের পরও আদী অনেক দিন বেঁচে ছিলেন। তিনি নবীজীর প্রতি ভালোবাসা ও ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন আজীবন। প্রিয় নবীর ভবিষ্যত বাণী অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হতে দেখেছেন।

এই বিখ্যাত সাহাবী আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) প্রায় সময় বলতেন–

ঃ আমি আমার জীবদ্দশাতেই দেখেছি মুসলমানরা বেবিলনের শ্বেত প্রাসাদসমূহ জয় করেছে। মুসলিম জাহানে এমন শান্তি-শৃঙ্খলা দেখেছি যে, ইরাক থেকে হেজাজে একা যে কোন মহিলা অনায়াসে সফর করতে পারতো।

স্বনির্ভর হওয়া উচিত

একদা কোন এক সফর থেকে ফিরছেন হযরত মুহাম্মদ (সা)। সাথে বেশ ক'জন সাহাবী। সারাদিনের ক্লান্ত সফরে এক সময় খাওয়ার সময় হলো। কিন্তু খাবারের কি ব্যবস্থা করা যায় এ নিয়ে কথা হলো। পরে সিদ্ধান্ত হলো দুম্বা জবাই করে রান্না করা হবে। নবী মুহাম্মদ (সা)-এর নির্দেশে সবাই রান্নার আয়োজন করতে লাগলেন।

সাহাবীরা সবাই পরমার্শ করে কাজ ভাগাভাগি করে নিলেন।

কেউ দুম্বা জবাই করবেন।

কেউ চামড়া খসাবেন।

কেউ গোস্ত বানাবেন।

কেউ করবেন রান্না।

আবার কেউ সকলকে খাবার পরিবেশন করবেন।

এভাবে সাহাবীরা প্রত্যেকেই কাজ বন্টন করে নিলেন। প্রিয় নবীও কাজ করতে চাইলেন। বললেন–

ঃ আমি ও তোমাদের সাথে কাজ করতে চাই। আমাকেও কিছু কাজ দাও।

সাহাবীরা নবীজীর একথা শুনে অবাক হলেন। তারা বললেন–

ঃ সে কি কথা হুজুর। যা দরকার আমরাই করবো। আমরা থাকতে আপনি কাজ করবেন কেন? আপনাকে কোন কষ্ট করতে হবে না।

ঃ তা কি করে হয়। বললেন মহানবী।

ঃ যারা নিজেরা কোন কাজ না করে অপরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়, আল্লাহ্ তাদেরকে পছন্দ করেন না। আমি জানি তোমরা সব কাজই করতে পারবে। কিন্তু আমি সবার সাথে কাজ করতে ভালোবাসি। তাই আমি ঠিক করেছি রান্নার জন্য যে লাকড়ীর প্রয়োজন হবে, তা আমি সংগ্রহ করে আনবো। মনে রাখবে প্রত্যেকেরই স্বনির্ভর হওয়া উচিৎ। ইসলামের আদর্শ এটাই।

সবাই চুপ রইলেন। কিছু বললেন না। নবীজী কথা শেষ করে জঙ্গলে চলে গেলেন। জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করলেন। আর কাঠের বোঝাটা নিজেই কাঁধে করে বয়ে নিয়ে এলেন।

এভাবে মহানবী নিজে শ্রমের কাজ করে শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

সংসার নয় দায়িত্ব বড়

গতকাল মাত্র আবু বকর খলীফা নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর উপর এখন ইসলামী রাষ্ট্রের বিশাল দায়িত্ব। নতুন দায়িত্ব পেলে কত ঝামেলা পোহাতে হয়। কিন্তু আবু বকরের সেদিকে পরোয়া নেই। তিনি চলেছেন বাজারে।

পিঠে কাপড়ের বোঝা। প্রতিদিনই তিনি এই বোঝা নিয়ে বাজারে যান। কারণ তিনি একজন জাত ব্যবসায়ী। কাপড়ের ব্যবসা করে তিনি সুনাম, অর্থকড়ি সব কুড়িয়েছেন।

আজও চলেছেন ব্যবসার কাজে। লোকেরা তাঁকে দেখে অবাক হচ্ছে। ব্যাপার কি? আবু বকর তো এখন ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা। তিনি কাপড়ের বোঝা নিয়ে বাজারে যাচ্ছেন? তিনি যদি এখন ব্যবসা করে ঘুরে বেড়ান তাহলে রাষ্ট্র চালাবে কে?

লোকদের মনে আরো নানা প্রশ্ন। কিন্তু এ কথাটা তাঁকে বলবে কে?

কাপড়ের বোঝা কাঁধে নিয়ে তিনি প্রায় বাজারের কাছে এসে গেছেন। এমন সময় সামনে এসে দাঁড়ালেন দু'ব্যক্তি। আবু বকর ভাবতে পারেননি যে

তার সামনে এভাবে কেউ পথ আগলে দাঁড়াবে। তিনি থতমত খেলেন। দেখলেন সামনে দাঁড়িয়ে আছেন হযরত ওমর ও আবু উবায়দা।

ঃ ব্যাপার কি ওমর, আবু উবায়দা? তোমরা যে একেবারে পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছো?

ঃ আপনার কাঁধে কি?

ঃ কাপড়।

ঃ কোথায় নিচ্ছেন?

ঃ কেন বাজারে। অবাক হলেন আবু বকর তাদের প্রশ্ন শুনে।

ঃ বাজারে এসব বেঁচে আপনি ব্যবসা করবেন। আর খেলাফত চলবে কি করে?

ঃ খেলাফতের তো কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

ঃ আপনি সারাদিন ব্যবসা করে ঘুরে বেড়াবেন। তাতেই তো আপনার সময় শেষ হয়ে যাবে। রাষ্ট্র চালাবেন কখন?

ঃ কিন্তু আমার সংসার চলবে কি করে? যদি আমি ব্যবসা না করি?

ঃ বায়তুল মাল থেকে আপনার সংসার চলবে।

ঃ কিন্তু বায়তুল মালে তো আমার হক নেই।

ঃ তা আমরা দেখবো। আপনার খেলাফতের কাজ করতে করতেই আপনার সময় চলে যাবে। আপনি ব্যবসা করবেন কখন?

আবু বকর ভাবলেন তাই তো। এতবড় দায়িত্ব তাঁর উপর। আর সে চলছে ব্যবসা করতে। তিনি এটা গভীরভাবে উপলব্ধি করলেন। তিনি ভাবলেন সংসারের চেয়ে তাঁর খেলাফতের দায়িত্ব অনেক অনেক বড়। তিনি তো সংসারের জন্য এতবড় দায়িত্বের অবহেলা করতে পারেন না। তিনি ওমর ও আবু উবায়দাকে বললেন−

ঃ চলো ফিরে যাই।

ওমর ও আবু উবায়দা আনন্দিত হলেন। এরপর সবাই বাড়ীর দিকে ফিরে চললেন।

দুধ দোহাবেন খলীফা

মদীনার একটি এলাকার নাম 'সাখ'। এখানেই বাস করেন আবু বকর।

এই সাখ পল্লীর মানুষদেরকে আবু বকর বিভিন্নভাবে উপকার করতেন। কাজ করে দিতেন।

এই যেমন ধরো টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করা। কাপড়-চোপড় দেয়া।

ঘর দোর বানিয়ে দেয়া।

এমন কি বকরী দোহন করে পর্যন্ত দিতেন।

এই সাখ পল্লীর একটি ছোট্ট মেয়ে। তার কেউ নেই। তার অনেকগুলো বকরী। সে এগুলোকে মাঠে নিয়ে ঘাস খাওয়ায়। লালন-পালন করে। কিন্তু এতটুকুন ছোট্ট মেয়ে। সে তো আর এতগুলো বকরীর দুধ দোহন করতে পারে না। সেই আবু বকর। যিনি এই পল্লীর সবার প্রিয়। তিনি এই ছোট্ট মেয়েটির বকরীর দুধ দোহন করে দেন। মাখন তৈরী করে দেন।

একদিন আবু বকর খলীফা হলেন। হলেন ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক। সাথ পল্লীর লোকেরা যেদিন জানলো আবু বকর ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনকর্তা হয়েছেন। সেদিন তারা খুব খুশী হয়েছিল। আনন্দ-ফুর্তি করেছিল।

শুধু ঐ ছোট্ট মেয়েটি খুশী হতে পারেনি। সে লোকদের সাথে আনন্দেও অংশ নেয়নি। সে দরজা বন্ধ করে ঘরে বসেছিল। অভিমানে কারো সাথে কথাও বলেনি। তবে কেঁদেছিল।

লোকদের আনন্দের সময় আবু বকরের মেয়েটির কথা মনে হলো। তিনি ছুটে গেলেন মেয়েটির বাড়ী। বাড়ীতে গিয়েই আবু বকর অবাক হলেন। মেয়েটি কাঁদছে। কেন? মেয়েটি কাঁদছে কেন?

তিনি মেয়েটিকে আদর করে জিজ্ঞেস করলেন–

ঃ কাঁদছো কেন মা?

মেয়েটি অভিমানে কথা বলে না। আবু বকর আবার জিজ্ঞেস করেন–

ঃ কি হয়েছে মা। বল না শুনি।

এবার মেয়েটি কথা বললো অভিমানের সুরে।

ঃ আপনাকে খলীফা হতে কে বলেছে?

ঃ কি করবো বলো। লোকেরা আমাকে জোর করে খলীফা বানিয়ে দিয়েছে।

ঃ বলেন তো এখন আমার বকরীর দুধ দোহন করে দেবে কে? আপনি তো এখন খলীফা। খলীফা কি বকরীর দুধ দোহন করবে?'

মাখন বানিয়ে দেবে।

এবার আবু বকর হেসে ফেললেন। বললেন–

ঃ এই জন্যেই তুমি এত রাগ করে আছো? ভেবো না। আগে যেমন তোমার বকরীর দুধ দোহন করে দিতাম। মাখন বানিয়ে দিতাম। এখনো তাই দেব। খলীফা হয়েছি। কি হয়েছে। খলীফা তো মানুষই, এবার বকরীগুলো নিয়ে মাঠে যাও।

মেয়েটি আবু বকরের কথা মন দিয়ে শুনছিল। এতক্ষণে মেয়েটির মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠলো। একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ছেড়ে বকরীগুলো নিয়ে মেয়েটি মাঠে চলে গেল।

চিনি ফিরিয়ে দিলেন

হযরত আবু বকরের বাড়ীতে খুব কড়াকড়ি। সবকিছু ঠিকঠাক মত হওয়া চাই। কোনকিছুতে বাড়াবাড়ি চলবে না। তাঁর পরিবারের জন্য যা বরাদ্দ তা দিয়েই সংসার চালাতে হবে।

ইসলামের প্রথম খলীফা আবু বকরের এই নির্দেশ।

প্রতিমাসে বায়তুল মাল থেকে আসে আটা, ময়দা, খেজুর, মধু, চিনি। আরো আসে কাপড়-চোপড়। শুধুমাত্র যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই পান তিনি।

এ দিয়েই সংসার চালান আবু বকরের স্ত্রী হাবীবা। মাপা মাপা জিনিস দিয়ে কি আর ইচ্ছামত খাওয়া-দাওয়া করা যায়? সংসারে ছেলে-মেয়েরা আছে। তাদের কত কি খেতে মন চায়। কিন্তু রাষ্ট্র প্রধানের স্ত্রী হয়েও হাবীবা তাদের তা দিতে পারেন না।

একবার ছেলে-মেয়েরা মিষ্টি খেতে চাইলো। হালুয়া। কত আবদার ছেলে-মেয়েদের। হালুয়া তাদের চাই-ই।

কিন্তু আবু বকরের স্ত্রী হাবীবা তাদেরকে হালুয়া দিবেন কোথেকে। হালুয়া বানাতে ময়দা লাগে, চিনি লাগে। আর লাগে ঘি। এসব তিনি পাবেন কোথায়।

একদিন ছেলে-মেয়েদের আবদারের কথা খলীফা আবু বকরের কাছে বললেন স্ত্রী হাবীবা।

খলীফা বললেন–

ঃ চিনি পাবো কোথায়।

ঃ কেন? কিনে আনবেন। স্ত্রী হাবীবা বললেন–

স্ত্রীর কথা শুনে চিন্তিতভাবে বললেন আবু বকর–

ঃ চিনি কিনতে টাকা লাগবে না?

ঃ বায়তুল মাল থেকে টাকা চেয়ে নিন।

ঃ না না। বায়তুল মাল থেকে টাকা চাইতে পারবো না।

তাহলে আপনি বলে দিন কিছু চিনি দিয়ে যাক। বেশী লাগবে না। আপনি বললেই ওরা দিয়ে যাবে।

ঃ না, আমার জন্য যা বরাদ্দ আছে তার বাইরে আমি চিনি আনতে পারবো না।

খলীফা আবু বকরের দৃঢ়তা দেখে স্ত্রী হাবীবা আর এ নিয়ে কথা বললেন না।

কিন্তু তিনি তো মা। ছেলে-মেয়েদের মুখের দিকে চেয়ে তিনি বসে থাকলেন না। বরাদ্ধ কৃত চিনি থেকে তিনি প্রতিদিন অল্প অল্প করে চিনি বাঁচাতে লাগলেন।

একদিন দেখা গেল তার কাছে হালুয়া বানাবার মত চিনি জমা হয়েছে। তিনি খলীফাকে বললেন–

ঃ এবার কিছু ময়দা এনে দিন।

ঃ ময়দা দিয়ে কি হবে?

ঃ হালুয়া তৈরি করবো।

ঃ হালুয়া তৈরি করবে? চিনি পেলে কোথায়?

ঃ আমাদের প্রতিদিনের খরচ থেকে অল্প অল্প করে বাঁচিয়ে জমিয়েছি।

ঃ দেখি কি পরিমাণ জমিয়েছ?

হাবীবা আবু বকরকে তা দেখালেন। খলীফা তা দেখে ভাবনার পড়ে গেলেন। খরচ না করে যে চিনি জমানো হয়েছে, তা না হলেও তো আমাদের চলে যায়। কোন অসুবিধা হয় না। এতদিন হাবীবা যা জমিয়েছে তা আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত।

ভাবনা শেষ করে আবু বকর বায়তুলমালের লোকদের খবর দিলেন। বায়তুল মালের লোক তার আছে এলে আবু বকর জমানো সব চিনি তুলে দিলেন। আর বলে দিলেন যে পরিমাণ চিনি তুমি ফেরত নিয়ে যাচ্ছো। এই পরিমাণ চিনি আমার বরাদ্দ থেকে যেন কমিয়ে দেয়া হয়। এই চিনি না হলেও আমার সংসার চলে। এটা অন্যদের জন্য বরাদ্দ করে দাও।

পরকালের ভয়

হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর এক গোলাম ছিল। সে প্রতিদিন কিছু উপার্জন করতো। আর সেই অর্থ প্রদান করতো আবু বকরকে। গোলামটির মুক্ত হওয়ার জন্য এটি একটি শর্ত ছিল।

প্রতিদিনের মত গোলামটি আজো কাজে বেরিয়েছে। আজ আর তেমন কাজ পায় না সে। ঘুরতে ঘুরতে সে এক গোত্রের কাছে এসে পড়লো। দেখলো ভীষণ ধূমধাম। ব্যাপার কি? এগিয়ে গেল সে। গিয়ে জানতে পারলো এ গোত্রে আজ বিয়ের অনুষ্ঠান হচ্ছে। বিশাল আয়োজন। মেহ্মানদের জন্য প্রচুর খাবার পাক করা হয়েছে। এ এক এলাহী কাণ্ড!

গোলামের মনটা খারাপই হয়ে গেল। নাহ্। আজ কোন কাজ পাবো না। যাই। ফিরে যাই মালিকের কাছে। এই ভেবে সে ফিরে চলতে শুরু করেছে। এমন সময় এক লোকের সাথে তার দেখা। লোকটি তার পরিচিত। শুধু পরিচিতই নয়। জাহেলী যুগে তাকে সে একটি উপকারও

করেছিল। উপকারটি কি ছিল। এই লোকটি তখন অসুস্থ ছিল। ওই গোলাম তাকে সেদিন মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিয়ে সারিয়ে তুলেছিল। সেই তখনই এই লোকটির পক্ষ থেকে গোলামকে কিছু দেয়ার ওয়াদা করা হয়েছিল।

আজ যখন ঐ লোকটির সাথে গোলামের দেখা হলো, তখন তো আর তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেয়া যায় না। তাও আবার বিয়ের অনুষ্ঠান। খাবার দাবারের অনুষ্ঠান। লোকটি গোলামকে বললো–

ঃ তোমার তো আমার কাছে কিছু পাওনা আছে। আজ যখন এসেছো তবে কিছু খাবার নিয়ে যাও।

গোলামটি না করলো না। বেশ কিছু খাবার নিয়ে গোলাম ফিরলো আবু বকরের বাড়ী। এসেই ঐ খাবারগুলো রাখলো হযরত আবু বকরের সামনে।

আবু বকর খাবার সামনে পেয়েই খেতে শুরু করলেন।

গোলাম কিছুটা অবাক হলেন। ভাবলো ব্যাপার কি? প্রতিদিন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আমি কিভাবে অর্থ উপার্জন করেছি। অথচ আজ যে খাবার আনলাম তা তো জিজ্ঞেস করলেন না। কোত্থেকে খাবার আনলাম। আর কে-ই বা দিয়েছে? কেনই বা দিয়েছে?

আবু বকর খাবারের লোকমা মুখে পুরে দিয়েছে। এমন সময় গোলাম তার মনে জেগে উঠা প্রশ্নটি করে বসলো।

আবু বকর বললেন–

ঃ খুব ক্ষিধে পেয়েছিল। তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করার কথা মনেই ছিল না। এবার বলো কিভাবে এ খাবার পেয়েছ।

গোলাম তার মন্ত্র পড়ে ফুঁক দেয়ার কাহিনী বললো। আর মন্ত্র পড়ে ফুঁক দেয়ার কারণেই যে এ খাবার পেয়েছে, তাও জানালো। তা শুনে আবু বকরের চোখ লাল হয়ে উঠলো।

ঃ কি? মন্ত্র পড়ে উপার্জন করা খাবার এনেছ? তুমি তো দেখি আমাকে ধ্বংস করার জোগাড় করেছ।

বলেই গলায় হাত ঢুকিয়ে দিলেন। উদ্দেশ্য বমি করা। কিন্তু গিলে ফেলা খাবার কিছুতেই বের করা সম্ভব হলো না। তিনি বার বার বমি করার চেষ্টা করতে থাকলেন।

পাশেই লোকজন ছিল। আবু বকরের অবস্থা দেখে একজন এগিয়ে এলো। বললো পানির মাধ্যমে বমি হতে পারে।

আবু বকর (রাঃ) পানির পাত্র চেয়ে নিলেন। তা থেকে পান করলেন। তারপর আবারো বমি চেষ্টা করেন। এক সময় বমি করে ফেলেন।

অবশেষে গিলে ফেলা খাবারগুলোও বেরিয়ে আসে বমির সাথে।

একজন লোক তখন বললো–

ঃ আল্লাহ্ আপনার উপর রহম করুন। আপনি এক লোকমা খাদ্যের জন্য এত কষ্ট করলেন।

আবু বকর উত্তরে বললেন–

ঃ প্রিয় নবী (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি। হারাম খাদ্য দ্বারা গঠিত দেহের জন্য দোজখের আগুনই বেশী উপযোগী। আমার ভয় হয় এই খাবার দ্বারা আমার শরীরের কোন অংশ তৈরী হয়ে না যায়।

এই ছিল একজন খোদাভীরু শাসকের পরকালের ভয়।

গোপনে কাজ করেন

হযরত আবু বকরের খেলাফত কাল। মদীনায় বাস করতো এক অন্ধ মহিলা। মহিলার ত্রিকুলে কেউ নেই। তার উপর সে বৃদ্ধা। তাই তার চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া খুব কষ্ট হতো।

ইসলামী রাষ্ট্রে এরকম একজন মহিলা মানবেতর জীবন-যাপন করবে, তা হয় না। তাই হযরত ওমর এই অন্ধ মহিলার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নিলেন।

হযরত ওমর প্রতিদিন যথাসময়ে মহিলাকে খাবার পৌঁছানো সহ যাবতীয় কাজ করতেন। এভাবে কিছুদিন গেল।

একদিন হযরত ওমর খাবার নিয়ে এলেন। এসেই বললেন–

ঃ বুড়ি মা! আপনার জন্য খাবার নিয়ে এসেছি।

ঃ কে! কে আবার খাবার নিয়ে এসেছো। আমি তো একটু আগেই খাবার খেলাম।

হযরত ওমর ভাবনায় পড়লেন। ব্যাপার কি? আমিই তো প্রতিদিন তাকে খাবার দিই। এখন শুনছি অন্য কেউ খাবার খাইয়ে গেছে। হযরত ওমর কিছু বুঝতে পারলেন না। শুধু এটুকু বুঝলেন যে অন্য কেউ এসে এই মহিলাকে খাবার খাইয়ে যায়। হযরত ওমর কিছু না বলে চলে গেলেন।

পরদিন ওমর যথাসময়ে এলেন। সেদিনও কে যেন এসে বুড়িকে খাইয়ে গেল। অন্যান্য কাজও করে দিয়ে গেল।

সেদিনও হযরত ওমর ফিরে চলে গেলেন। এরপর দিন আবার হযরত ওমর বুড়ির কাজ করতে এলেন। বুড়িকে বললেন–

ঃ আমি কাজ করতে এসেছি।

বুড়ি বললো–

ঃ আমার কাজতো একটু আগেই কে যেন করে দিয়ে গেল।

এবার হযরত ওমর ঠিক করলেন। কে এই লোক। যে প্রতিদিন আমার আগে এসে কাজ করে দিয়ে যায়? তাকে আমার বের করতে হবে। যেই ভাবা, সেই কাজ।

হযরত ওমর একদিন গোপনে লুকিয়ে থাকলেন। দেখলেন হযরত আবু বকর এসে আজ বুড়ির কাজ করে দিয়ে যাচ্ছে। খেলাফতের কঠিন দায়িত্বও তাকে এই বুড়ির কাজ করা থেকে ফিরাতে পারে নি।

হযরত ওমর তাকে দেখামাত্রই চিৎকার করে উঠলেন–

ঃ নিশ্চয় আপনি। খোদার শপথ। আপনি ছাড়া এই কাজ কেউ করতে পারে না। প্রতিদিন আপনি আমাকে এই সওয়াবের কাজে হারিয়ে দেন।

একবার তুমি একবার আমি

জেরুজালেম থেকে খবর এলো। কাসেদ খবর নিয়ে এসেছেন। বায়তুল মোকাদ্দস দখলে আসা মুসলমানদের এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। চারমাস অবরুদ্ধ থাকার পর খ্রিষ্টান পাদ্রীরা হাল ছেড়ে দিল। তারা বললো মুসলমানদের খলীফা এসে জেরুজালেম দখল করবে সন্ধিনামায় সই করে। এ খবরই নিয়ে এসেছিল কাসেদ।

হযরত ওমর তখন ইসলামী সালতানাতের খলীফা। তিনি সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন। হযরত আলীকে অস্থায়ী খলীফা নিযুক্ত করে তিনি রওয়ানা হলেন জেরুজালেমের পথে। যে করেই হোক মুসলমানদের পবিত্রস্থান মুসলমানদের হাতে আনতেই হবে।

রওয়ানা হলেন হযরত ওমর আর একজন খাদেম। ঘোড়ায় চড়লেন তিনি। ঘোড়াতে ওঠেই হযরত ওমরের যেন কেমন লাগলো। কিছুটা গর্ব ভাব এসে গেল তার মধ্যে। নাহ্ ঘোড়া নিয়ে যাওয়া যাবে না। খাদেমকে দিয়ে একটি ভালো উট আনালেন তিনি। উটে করেই তারা যাবেন।

চললেন দু'জন। সাথে নিলেন একটি পানির মশক। সামান্য কিছু খেজুর। আর পোষাকে-আষাক সাদামাটা। যা তিনি সব সময় পরেন। পরনের কাপড়ে কোথাও কোথাও জোড়াতালি ছিল।

উটের পিঠে বাঁধলেন খেজুরের থলে আর মশক। একটি মাত্র উট। এতে তো দু'জন একসাথে যাওয়া যায় না। কি করবেন তারা। হ্যাঁ ঠিক হলো একদিন খলীফা চড়বেন খাদেম উট টানবে। অন্যদিন খাদেম চড়বে খলীফা উট টানবেন।

এভাবে পালাক্রমে তারা জেরুজালেমের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। জেরুজালেমের অধিবাসীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে আমীরুল মোমেনীন আসবেন। কত জাঁকজমক হবে। অনেক সেপাই যাবে তার সাথে। মহাসমারোহে তিনি জেরুজালেম যাবেন। কিন্তু না মানুষের খলীফা তা করলেন না। অত্যন্ত সাদামাটা ভাবে তিনি চললেন। একদিন খলীফা চড়েন। অন্যদিন খাদেম।

যেদিন তারা জেরুজালেম পৌঁছেন সেদিন উট চড়ার পালা ছিল খাদেমের। খাদেম খলীফাকে বার বার অনুরোধ করলেন–

ঃ আজ আপনি উটে আরোহন করুন। আমি উটের লাগাম টানি। আমি উটে চড়ে যাবো আর আপনি লাগাম টানবেন তা হতে পারে না।

হযরত ওমর খাদেমের অনুরোধটি অগ্রাহ্য করে বললেন–

ঃ আজ আমার লাগাম টানার পালা। আজ আমিই টানবো। এতে অসম্মানের কিছু নাই। যেদিন যার পালা সে হিসেবেই কাজ করতে দাও।

খাদেম অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে বললো–

ঃ আমীরুল মোমেনীন। যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আমার পালা আজ আপনাকে দান করলাম। দয়া করে আপনি উটে আরোহন করুন।

ঃ তুমি তোমার আরোহনের পালা পালন করেছ সত্য। কিন্তু তোমাকে আমার লাগাম টানার পালা দেব না। কারণ পরবর্তীতে লোকেরা যাতে একথা বলতে না পারে যে নেতা হলে একদিন বেশী পায়। তাই তুমি তোমার পালায় থাকো। আমি আমার পালায়। বললেন হযরত ওমর।

খাদেম বললো–

ঃ তাহলে আপনি উট টেনে যান। আমি হেটে আপনার সাথে যাই।

হযরত ওমর তা মানলেন না। অবশেষে বাধ্য হয়েই খাদেম উটে চড়ে বসলো। আর খলীফা উটের লাগাম টেনে চললেন।

তারা জেরুজালেমের জারিয়াতে পৌঁছে গেলেন।

বায়তুল মোকাদ্দসবাসী তখনো বুঝতে পারেনি যে আমীরুল মোমেনীন এসে গেছেন। কারণ তাদের ধারণা ছিল অন্য রকম। কিছু সৈনিক এগিয়ে এসেছিল খলীফাকে স্বাগত জানাতে। মুসলমানরা দেখলো খলীফা খুবই সাধারণভাবে এসেছেন। তাই তারা তাকে সম্বর্ধনা দেয়ার জন্য একটি ঘোড়া ও ভালো পোশাকের ব্যবস্থা করলেন।

হযরত ওমর তা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন–

ঃ আল্লাহ পাক আমাকে যে সম্মান দান করেছেন, তা ইসলামের মাধ্যমেই দান করেছেন। পোষাকের মাধ্যমে নয়। আমার জন্য আল্লাহর দেয়া সম্মানই যথেষ্ট।

মুসলমান সৈনিকরা কিছুটা ঘাবড়ে গেলেন হযরত ওমরের কথা শুনে। হযরত ওমর আবার বললেন–

ঃ তোমাদের দেখে আমার আফসুস হচ্ছে যে তোমরা খুবই তাড়াতাড়ি বিজাতীয় সংস্কৃতি গ্রহণ করে ফেলছো।

কথা শেষ করে আরো এগিয়ে গেলেন তিনি। জেরুজালেমের লোকেরা মনে করলো যে দু'জন লোক উট নিয়ে এসেছে তারা খলীফার অগ্রদূত। তারা খলীফাকে এক নজর দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে পথের দিকে তাকিয়ে আছে। আর মুসলমানদের ভীড়ের সাথে এগিয়ে চলছেন তারা দু'জন।

জেরুজালেমের লোকেরা এরপর জানতে পারলো উটের আরোহীদের একজন খলীফা। একজন খাদেম। তারা সবাই খলীফাকে দেখার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়লো। কে খলীফা নিশ্চয় উটে আরোহনকারীই হবেন সেই খলীফা। তবে এমন সাদামাটা পোষাক কেন? এরা কানাঘুশা করতে লাগলো পরস্পর। তারা দূর থেকে খলীফাকে দেখতে লাগলো। আর বলতে থাকলো–

ঃ ঐ তো খলীফা ঐ যে তিনি।

উটের আরোহী দু'জন জনতার ভিড়ের মাঝখানে চলে গেল। এবার খাদেম বললো–

ঃ আমীরুল মোমেনীন! আমি এবার নামি। আমরা এসে গেছি।

একথা শুনে সবাই তাজ্জব বনে গেল। আরে আমরা তো ভেবেছিলাম খলীফা উটে চড়ে আসবেন। এখন দেখি খাদেম উটে চড়েছে। আর খলীফা লাগাম টানছে। তাদের বিস্ময়ের ঘোর থামে না। তারা অবাক হয়ে কুল পায় না এটা কি করে সম্ভব। মুসলিম জাহানের খলীফা উটের লাগাম টেনে আসবে। আর খাদেম উটে চড়ে!

জেরুজালেমবাসী খলীফার এই সাদামাটা আর অনাড়ম্বর নিরহংকার চরিত্র দেখে অভিভূত হলো। তারা নানা রকম প্রশংসা করতে থাকলো খলীফার।

হাজার হাজার জনতা খলীফাকে ঘিরে আছে। একজন বৃদ্ধ জনতার মাঝখান থেকে উঠে খলীফার হাতে বায়তুল মোকাদ্দাসের চাবী তুলে দিলেন। বায়তুল মোকাদ্দাস মুসলমানদের হস্তগত হলো।

এই হলেন হযরত ওমর। মানুষের খলীফা। মুসলমানদের খলীফা। ইসলামী সাম্রাজ্যের অধিপতি, শাসক। এমন শাসক মিলবে কি আর এই ধরাতে ফের?

লাভের টাকা বাইতুলমাল

কেউ যখন রাজা হয় তার কি কোন কিছুর অভাব থাকে? থাকে না। একজন রাজার থাকে উজীর-নাজির, পাইক-পেয়াদা। থাকে দাস-দাসী। অন্যদিকে থাকে অট্টালিকা, বালাখানা। রাজ্যের সমস্ত ধন সম্পদের মালিক হয়ে যায় তখন রাজা। যত রকমের সুযোগ-সুবিধা সব নিজের জন্য। ছেলে-মেয়েদের জন্য। আর তার নিজের লোকদের জন্য।

কিন্তু আমি বলছি এমন এক রাজার কথা। যার ছিল না কোন বালাখানা। ছিল না সুরম্য রাজ প্রাসাদ। খেজুর পাতার বিছানা ছিল তার নিত্য সঙ্গী। তিনি সরকারী সম্পত্তি নিজে অন্যায়ভাবে ভোগ করতেন না। আর কাউকে তা ভোগ করতেও দিতেন না। তিনি হলেন ফারুকে আজম হযরত ওমর।

একবার তার ছেলে আবদুল্লাহ একটি উট কিনেছিলেন। উটটি দেখতে তেমন ভালো ছিল না। দুর্বল উট। তার হাড়গুলো গোনা যেত। আর এ রকম একটা শুকনো উটের দামই বা কত? খুবই কমদাম দিয়ে এটি কিনে নিয়ে আসেন আবদুল্লাহ।

কিন্তু এরকম দুর্বল উট দিয়ে কি হবে। তিনি ভাবলেন এটাকে মোটাতাজা করতে হবে। তাই তিনি সরকারী খামারে উটটিকে কিছু দিনের জন্য ছেড়ে দিলেন।

কিছুদিন সরকারী খামারে ভাল খাবার পেয়ে উটটি মোটাতাজা হয়ে উঠলো। দেখতেও বেশ সুন্দর হলো।

একদিন আবদুল্লাহ ইবনে ওমর এই মোটাতাজা উটটিকে বিক্রয় করতে নিয়ে গেলেন। হযরত ওমর ছিলেন তখন সেখানে। তিনি দেখলেন তার ছেলে একটি সুন্দর উট বিক্রি করছে। এগিয়ে গেলেন তিনি। গিয়ে তার ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন–

ঃ এই উট তুমি কোথায় পেলে?

ঃ এটা আমি কিনেছিলাম। খুব দুর্বল উট ছিল। দামও ছিল কম।

ঃ কই। আগে তো দেখি নি?

ঃ আমি এটাকে সরকারী খামারে কিছুদিনের জন্য ছেড়ে দিয়েছিলাম। ওখানে ভাল খাবার পেয়ে এমন বলিষ্ঠ ও সুন্দর হয়েছে।

হযরত ওমর তখন আর তাকে কিছু বললেন না। উটটা খুব ভালো দামে বিক্রি হয়ে গেল।

বিক্রি হয়ে যাওয়ার পর হযরত ওমর তার ছেলেকে ডেকে বললেন–

ঃ উটের আসল দাম রেখে বাকী টাকা তুমি বাইতুল মালে জমা দিয়ে দাও।

কারণ হযরত ওমর জানতেন সরকারী খামারে আবদুল্লাহর অধিকার নেই। সে উটটিকে ওখানে ছেড়ে দিয়ে যে লাভবান হয়েছে ওটা তার হতে পারে না।

এই হলেন শাসক। প্রতিটি ক্ষেত্রে যিনি সততার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

নিজের জন্য করে না কিছুই

কেউ রাষ্ট্র প্রধান হলে তাকে অনেক কাজ করতে হয়। থাকতে হয় তাকে নানান কাজে ব্যস্ত। রাজ্য চালনার যাবতীয় কাজ দেখাশোনা ছাড়াও তাকে অনেক কাজ করতে হয়। যেমন—বর্হির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ বা বিদেশী কোন দূত এলে তার সাথে সাক্ষাৎ। তার খোঁজ-খবর নেয়া। কথা বলা। আরো কত কি?

হযরত ওমরের সময়কাল। খেলাফতের মহান দায়িত্ব তার উপর।

একবার বিদেশ থেকে একদল প্রতিনিধি তার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলো। হযরত ওমর তখন তার দরবারে ছিলেন না। দরবারের অন্য কর্মচারীরা প্রতিনিধি দলকে দরবারে বসতে দিলেন। আর বললেন আমীরুল মোমেনীন বাড়ীর ভেতরে আছেন।

প্রতিনিধি দল দরবারে বসে রইলেন হযরত ওমরের প্রতীক্ষায়।

হযরত ওমর বাড়ীর ভেতরে কি করেন?

তার কাপড় চোপড় ময়লা হয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি ভিতরে গিয়ে তার ময়লা কাপড় চোপড় ধুইতে লাগলেন। ধুইয়ে কাপড় রৌদ্রে শুকাতে দিলেন।

ঐ দিকে প্রতিনিধি দল কতক্ষণ অপেক্ষা করবে। তারা বাড়ীর ভেতরে খবর পাঠালেন। ভেতর থেকে খবর এলো হযরত ওমর তার কাপড় ধুইয়ে শুকাতে দিয়েছেন। কাপড় না শুকানো পর্যন্ত তিনি আসতে পারছেন না। কারণ পরে আসার মত অন্য কোন কাপড় তার নেই।

এ খবর শুনে বিদেশী প্রতিনিধি দল হতবাক হয়ে গেল। কি অবাক কাণ্ড। ইসলামী রাজ্যের খলীফার এই অবস্থা যার পরনের কাপড় ব্যতিত আর কোন কাপড় নেই?

সত্যিকার শাসকদের এই অবস্থাই হয়। নিজের জন্য করে না কিছুই তারা। অপরের তরে শুধুই পাগলপারা।

লিখে দিন দাবী নেই

হযরত ওমর একদিন হেটে কোথাও যাচ্ছিলেন। কিছুদূর যাওয়ার পরই দেখলেন এক বৃদ্ধাকে। বৃদ্ধা কি যেন বিড় বিড় করছে। হযরত ওমর তার কাছে গেলেন। তার খোঁজ-খবর নিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন-

ঃ আচ্ছা বুড়ি মা। খলীফা ওমর সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? বুড়ি হযরত ওমরকে আগে কখনো দেখেনি। তাই তাকে সে চিনতে পারেনি। বুড়ি হযরত ওমরের প্রশ্ন শুনে কিছুটা বিরক্ত হলো। বললো-

ঃ ওমর টোমর দিয়ে আমি কি করবো। আমার কি এমন ঠেকা পড়লো যে তার খবর আমাকে নিতে হবে। নিজের চিন্তায় বাঁচি না। বুড়ির কথায় ছিল রাগ আর অসন্তোষের ছাপ।

হযরত ওমর আবার তাকে জিজ্ঞাসা করলেন-

ঃ বুড়ি মা, ওমরের ওপর তোমার এত রাগ কেন?

ঃ রাগ হবে না কেন? এই যে সে খলীফা হয়েছে সে তো কোন দিন আমায় একটি পয়সাও দিয়েছে? না কি কোনদিন আমার খোঁজ-খবর নিয়েছে আমি কি হালতে আছি। ও মানুষ ভালো না।

হযরত ওমর বুড়ির কথা শুনে বড়ই চিন্তিত হলেন। ঠিকই তো আমি তো তার কোন খোজ-খবর নিতে পারিনি। তিনি কিছুটা নরম হয়ে বুড়িকে আবার বললেন–

ঃ তুমি কি অবস্থায় আছো ওমর কি ভাবে জানবে? তুমি গিয়ে ওমরকে সব জানিয়ে আসলেই তো পারতে।

ঃ কেন? আমি জানাতে যাবো কেন? ওমরই তো আমীরুল মোমেনীন। সে–তো সবার খোঁজ-খবর নেবে। প্রত্যেকের–খবর রাখার দায়িত্ব তো তারই। রুক্ষ ভাষায় বৃদ্ধা জবাব দিলো।

হযরত ওমর শান্তভাবে আবার বললেন–

ঃ আচ্ছা, ওমর খলীফা হওয়ার পর তুমি যে কষ্ট পেয়েছ। সে কষ্টের বিনিময়ে কত টাকা পেলে তুমি ওমরকে মাফ করে দিবে?

বৃদ্ধার সাথে এসব কথাবার্তা চলছে। এমন সময় হযরত আলী ও হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে মাসউদ এসে উপস্থিত হলেন। তারা হয়তো কোথাও যাচ্ছিলেন। এসেই সালাম দিলেন।

ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া আমীরুল মোমেনীন। আগন্তুক দুই ব্যক্তির মুখে আমীরুল মোমেনীন শব্দ শুনে বৃদ্ধা তাজ্জব হয়ে গেল। সে ভয়ে কাঁপতে লাগলো। আর ভাবতে লাগলো হযরত ওমরের সামনেই সে তাকে এত গালমন্দ করেছে। সে দারুন অনুতপ্ত হলো। হযরত ওমর বুদ্ধাকে শান্তনা দিলেন। এরপর বৃদ্ধার হাতে পচিশটি স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে বললেন–

ঃ বুড়ি মা, তুমি এই চামড়ায় লিখে দাও যে কেয়ামতের দিন ওমরের কাছে আমার কোন দাবী নেই।

বৃদ্ধা তখন তাই করলো। চামড়ার ওপর তা লিখে দিলো বৃদ্ধা। আর হযরত আলী সাক্ষী হিসেবে তার উপর দস্তখত করলেন।

মধু খাওয়া হলো না

হযরত ওমর। ইসলামী খেলাফতের দ্বিতীয় খলীফা তিনি। মানে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক। শাসক হলে কি হবে? তিনি চলতেন খুবই সাধারণভাবে। সাধারণ মানুষের মতই ছিল তার জীবন। আরব, মিশর, সিরিয়া, ইরাক, ইরান বলতে গেলে অর্ধ পৃথিবীর শাসক হয়েও তিনি রাজার মত চলতেন না।

একবারের ঘটনা। তার স্ত্রী একদিন তাকে বললেন–

ঃ এতদিন ধরে জয়তুনের তৈল দিয়ে শুকনা রুটি খেতে খেতে অরুচি ধরে গেছে। যদি কিছু মধুর ব্যবস্থা হতো, তাহলে ঐ মধু দিয়ে রুটি খাওয়া যেতো।

খলীফা তার বেগমের কষ্ট বুঝতে পারলেন। কারণ তার নিজের অবস্থাও তো তা-ই। কিন্তু কি করবেন। বায়তুল মাল থেকে পান সামান্য ভাতা। যা দিয়ে কোন রকমে খলীফার সংসার চলে। সামান্য ভাতা থেকে তো আর

টাকা পয়সা বাঁচানো যায় না। টাকা জমানো গেলে হয়তো ঐ টাকা দিয়ে কিছু মধু কেনা যেতো। কিন্তু তা আর সম্ভব নয়।

খলীফা বসে ভাবছেন। বেগম কাছে এলেন। খলীফাকে ভাবতে দেখে বেগম বললেন–

ঃ বায়তুল মাল থেকে কিছু টাকা ধার নিলেই আমার মনে হয় কাজ হয়ে যায়।

খলীফা বেগমের কথা শুনলেন। কিছুক্ষণ ভাবলেন। হ্যাঁ তাইতো? কিছু টাকা ধার নিলেই তো মধু আনা যায়। যেই ভাবা, সেই কাজ। হযরত ওমর বায়তুল মালের পরিচালকের কাছে যেতে রওনা হলেন।

এমন সময় খলীফার পুত্র সামনে এসে হাজির।

বললেন–

ঃ আব্বা জান। আপনি কি আগামী কাল বেঁচে থাকবেন বলে আশা করেন?

ঃ না, আগামী কাল কেন? এই মুহূর্তের পরই আমার কি হবে আমি তা জানি না।

ঃ তাহলে আপনি কেমন করে ঋণ করতে পারেন?

ছেলের কথা শুনে হযরত ওমর ভয়ে কেঁপে উঠলেন। হায়, একেবারে সত্যকথা। যে জীবনের কোন নিশ্চয়তা নেই, সেই জীবনে ঋণ করা তো মোটেই উচিত নয়।

আজ ঋণ করবো। কিন্তু পরে ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্বে নিশ্চয়তা দেবো কিভাবে?

না। হযরত ওমর আর বায়তুল মালে ঋণ করতে গেলেন না। আর তার মধু খাওয়াও হলো না। শেষ পর্যন্ত বেগমকেও মধু খাওয়ার আশা ছাড়তে হলো।

তলোয়ারেই সোজা করে দেবে

ইসলামী খেলাফতের তখন সুসময়। চারিদিকে শান্তির সুবাতাস বইছে। মানুষে মানুষে তখন খুবই সদ্ভাব। হযরত ওমর তখন ইসলামী খেলাফতের কর্ণধার। সে সময়ের এক ঘটনা বলছি।

বিশাল জনসভা। চারিদিকে লোকে লোকারন্য। হযরত ওমর জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করছেন। জনতাকে লক্ষ করে তিনি বললেন–

ঃ দেশের জনগণ। আপনারা যদি আমার মাঝে কোন বক্রতা দেখেন। তবে আমাকে সোজা করে দেবেন।

সামনে বিশাল জনতার ভীড় থেকে একলোক উঠে দাঁড়ালো। ঝনাৎ করে কোষ থেকে তরবারী বের করলো। এরপর তরবারী উঁচু করে বললো–

ঃ হে ওমর! যদি আপনার মধ্যে কোন বক্রতা দেখি তাহলে এই তলোয়ারই আপনাকে সোজা করে দেবে। লোকটির কথা শুনে হযরত ওমর

খুব খুশী হলেন। তিনি যেন নিজেকে হালকা মনে করলেন। এরপর আল্লাহ্ পাকের শুকরিয়া আদায় করে বললেন–

ঃ আল্লাহুর হাজার শোকর। তিনি ওমরের খেলাফতের মধ্যে এমন ব্যক্তিকেও সৃষ্টি করেছেন যে, তাঁকে তীক্ষ্ণধার তলোয়ার দিয়ে সোজা করতে পারে।

এই ছিল শাসক আর শাসিতের মধ্যে তফাৎ। এই ছিল নেতা আর কর্মীর মধ্যে ব্যবধান।

এ কাপড় দু'জনের

হযরত ওমরের খেলাফতের সময়। একবার মুসলমানরা কিছু ইয়ামনী চাদর লাভ করেন। চাদরগুলো ছিল গনিমতের মাধ্যমে লাভ করা।

মুসলমানরা প্রত্যেকেই এক একটি করে চাদর পেল। সেই হিসেবে হযরত ওমর একটি চাদর পেয়েছেন। আর তাঁর ছেলেও একটি চাদর পান।

চাদরগুলো ছিল ছোট। একটা চাদর দিয়ে জামা বানানো যায় না। অথচ হযরত ওমরের জামা খুব দরকার। ছেলে আবদুল্লাহ্ তার চাদরটি তার পিতাকে দিয়ে দেন। ফলে হযরত ওমর দুটো চাদর দিয়ে একটি জামা বানান।

এই জামা গায়ে দিয়ে একদিন হযরত ওমর মিম্বরে উঠে দাঁড়ালো বক্তৃতা দেয়ার জন্য। তিনি বক্তৃতা দিতে শুরু করে বলেন–

ঃ তোমরা আমার কথা শোন এবং মেনে চলো।

শ্রোতাদের মধ্য থেকে হযরত সালমান উঠে বললেন–

ঃ আমরা আপনার কথা শুনবোও না। মানবোও না।

ঃ কেন? হযরত ওমর বললেন।

ঃ আগে আপনি বলুন আপনার গায়ের যে জামা রয়েছে, তা কি করে বানালেন। আপনিও নিশ্চয় আমাদের মত একটি কাপড়ই পেয়েছেন। আর একটি কাপড়ে এতবড় জামা হওয়া সম্ভব নয়।

হযরত ওমর তখন শান্তভাবে বললেন–

ঃ এত তাড়াহুড়া করে সিদ্ধান্ত নিয়ো না।

ঃ তা হলে?

ঃ এই জামা আমার আর আমার ছেলে আবদুল্লাহর কাপড়ে তৈরী হয়েছে। অর্থাৎ দু'জনের কাপড় দিয়ে এই জামা বানানো হয়েছে।

এরপর তিনি আবদুল্লাকে ডেকে বললেন–

ঃ আমি তোমাকে খোদার শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করছি। তুমি বল, যে চাদর দিয়ে আমি জামা বানিয়েছি, তা তোমার চাদর কি-না?

হযরত আবদুল্লাহ বললেন–

ঃ হ্যাঁ, আমার চাদরও আছে এই জামায়।

হযরত সালমান তখন বললেন–

ঃ এবার আপনি বলুন কি হুকুম। আমরা শুনবো ও মেনে চলবো।

এই হলো একজন নীতিবান শাসকের কথা। তিনি ইচ্ছা করলে একটা কেন? অনেকগুলো চাদর রেখে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। নিজের ও ছেলের কাপড় জোড়া দিয়ে বানিয়েছেন নিজের কাপড়। এই হলো সত্যিকার ভালো মানুষের নির্দশন।

নিশিরাতে প্রজার পাশে

হযরত ওমরের রাজ্য শাসনের একটি অংশ ছিল রাতে প্রজাদের খোঁজ-খবর নেয়া। কার কি দুঃখ-দৈন্য আছে তা নিজ চোখে দেখা। আর সাধ্যমত তার উপকার করা।

একদিনের ঘটনা। গভীর রাত। সারা নগরীতে গভীর আঁধার নেমে এসেছে। সবাই গভীর নিদ্রায় মগ্ন। প্রতিদিনের মত আজও হযরত ওমর বেরিয়েছেন তার লক্ষ্য পানে।

নগরীর অলিগলি পেরিয়ে এলেন নগরীর বাইরে। সামনে ধূ ধূ মরুভূমি। নিঝুম রাতে মরুভূমিতে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক আর মরুর রাতজাগা প্রাণীদের ডাক ছাড়া কিছু শোনা যায় না।

আঁধার ডিঙ্গিয়ে সামনে এগুলেন তিনি। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়লো মিটমিটে আলোর শিখা। ব্যাপার কি? মরুভূমিতে এতরাতে আলোর শিখা

দেখা যায়? তিনি এগিয়ে গেলেন। দেখলেন একটা নতুন তাঁবু। পাশে একজন গ্রাম্য লোক দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে লোকটি হতাশাগ্রস্থ।

হযরত ওমর লোকটির সামনে গিয়ে সালাম দিলেন। জিজ্ঞেস করলেন–

ঃ আপনি কে?

লোকটি অপ্রস্তুত ছিল। থতমত খেয়ে জবাব দিলো–

ঃ জী, আমি একজন মুসাফির।

ঃ কোত্থেকে আসছেন, যাবেন কোথায়?

ঃ তেহেসার পল্লী থেকে এসেছি। যাবো রাজধানীতে।

ঃ এতরাতে নির্জন মরুতে তাঁবু ফেলে দাঁড়িয়ে আছেন? মনে হয় খুব জরুরী কাজে মদীনায় যাচ্ছেন?

ঃ হ্যাঁ, খুবই দুঃখ কষ্টে দিন কাটছে আমার। এখন আমার পাথর চিবিয়ে খাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নাই। তাই ভাবছি, মদীনায় খলীফার দরবারে যাবো। পথে রাত হয়ে গেল। তাই এখানে তাঁবু ফেলেছি। রাতটা এখানেই কাটাবো।

হযরত ওমর মুসাফিরের কথায় ব্যথিত হলেন। তিনি ভাবলেন লোকটার বড় কষ্ট। এমন সময় তাঁবুর ভেতরে মহিলার কাতর কণ্ঠ শোনা গেল। হযরত ওমর তৎক্ষনাৎ প্রশ্ন করলেন–

ঃ তাঁবুর ভেতরে মনে হয় কোন মহিলা কাঁদছে?

ঃ তাতে আপনার কি? কোন কুমতলব আছে নাকি?

ঃ না, মহিলা হয়তো কোন কারণে কষ্ট পাচ্ছেন। তিনি হয়তো আপনার স্ত্রীও হতে পারেন। যদি কষ্টের কারণ জানতে পেতাম, তাহলে হয়তো উপকারে আসতাম।

লোকটি এবার নরম সুরে বললো–

ঃ হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। তাঁবুর ভেতর আমার স্ত্রী। তিনি গর্ভবতী। হঠাৎ পথিমধ্যে তার প্রসব বেদনা শুরু হলো। আমি পুরুষ মানুষ। এসবের আমি কিছুই বুঝি না। তার যে কি হয়?

কথাগুলো বলেই মুসাফির একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। হযরত ওমর তার মনের অবস্থা বুঝতে পারলেন। কিছুক্ষণ কি যেন ভেবে তারপর বললেন–

ঃ ভাই, আপনি কিছু ভাববেন না। আমি এক্ষনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছি। আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল রাখুন।

একথা বলেই হযরত ওমর মদীনায় ফিরে এলেন। রাত আরো গভীর হলো। বাড়ীতে তার বেগম গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। হযরত ওমর বেগমের কাছে গেলেন। ধীরে ধীরে ডাকলেন। সাড়া পেয়ে ঘুম থেকে জাগলেন তাঁর বেগম। হযরত ওমর তাকে সব খুলে বললেন। সব শুনে বেগম বললেন–

ঃ কোথায় সে কাজ। আমাকে বলুন কি করতে হবে?

ঃ গ্রামের এক দরিদ্র মহিলা। মরুভূমিতে তার প্রসব বেদনা শুরু হয়েছে। খুব কষ্ট পাচ্ছে। তুমি সাহায্য করলে হয়তো সে এ বিপদ থেকে মুক্তি পেতে পারে।

ঃ আপনি আদেশ দিন প্রিয়তম স্বামী। আমি এক্ষণি যেতে প্রস্তুত।

ঃ আল্লাহ্ তোমার কল্যাণ করুক। জলদি তৈরী হয়ে নাও।

এরপর হযরত ওমর তার স্ত্রীকে প্রয়োজনীয় সবকিছু নিতে বললেন। খাবার তৈরীর কিছু খাদ্যদ্রব্য সাথে নিলেন তারা।

দু'জনেই দ্রুত পৌঁছে গেলেন তাঁবুর কাছে। হযরত ওমর তার বেগমকে তাঁবুর ভেতরে পাঠিয়ে দিলেন। আর মুসাফিরকে ডেকে কাছে আনলেন। এরপর বললেন–

ঃ আসুন। সারাদিন হয়তো কিছু খাননি। বাড়ী থেকে কিছু খাদ্যদ্রব্য এনেছি। আসুন এগুলো রান্না করে নিই।

লোকটি ধীরে সুস্থে হযরত ওমরের পাশে এসে বসলেন। হযরত ওমর মাটি খুঁড়ে চুলা বানালেন। আগুন জ্বেলে খাদ্য রান্না করতে রাখলেন।

এদিকে রান্না শেষ হলো। ঐ দিকে তাঁবুর ভেতর একটি শিশুর চিৎকার শোনা গেল। হযরত ওমরের বেগম তাঁবুর পর্দা ফাঁক করে ডেকে বললেন–

ঃ আমীরুল মোমেনীন! আপনার বন্ধুকে সুসংবাদ দিন। তার পুত্র সন্তান হয়েছে।

হযরত ওমর বললেন–

ঃ আলহামদুলিল্লাহ্।

মুসাফির তার পুত্র সন্তান লাভের সুসংবাদ পেয়ে যেমন খুশী হলো। তেমনি ভয়ে কাঁপতে লাগলো। তার চোখ যেন বন্ধ হয়ে এলো। টলতে টলতে হযরত ওমরের পায়ের উপর পড়ে বলতে লাগলো–

ঃ আপনি আমীরুল মোমেনীন? আপনি হযরত ওমর? সত্যিই আপনি মহান শাসক।

ঃ হ্যাঁ ভাই, আমিই তোমাদের খাদেম। একথা বলেই লোকটিকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

মুসাফির লোকটি হযরত ওমরকে কষ্ট দেয়ার জন্য ক্ষমা চাইলো। হযরত ওমর বললেন–

ঃ আমি তোমার কোন উপকার করিনি ভাই। আল্লাহ্ মাফ করুন যদি আমার অবহেলায় তোমার স্ত্রী ও তার সন্তানের খারাপ কিছু হতো। তাহলে কেয়ামতের দিন আল্লাহ্র কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হতো আমাকে। আমাকেই এজন্য জবাবদিহি করতে হতো।

এরপর রান্না করা খাবার তাঁবুর ভেতরে পাঠানো হলো। বাকী খাবার মুসাফির লোকটিকে খেতে দিলেন হযরত ওমর। এরপর বললেন–

ঃ এখন ঘুমিয়ে পড়ো। কাল আমার সাথে মদীনায় দেখা করো। দেখি তোমার জন্য কিছু করা যায় কিনা। এরপর মরুর নতুন মেহমান আর তার পিতামাতাকে এখানে রেখে তারা চলে গেল।

আপনিই আমাকে মাফ করে দিন

নিঝুম রাত। রাতের আঁধার যেন পৃথিবীকে গ্রাস করে ফেলেছে। সন্ধ্যার পর যে চাঁদটি উদিত হয়েছিল তাও বিদায় নিয়েছে অনেক আগে। শুধু জোনাক জ্বলা আলো নিয়ে আকাশে জেগে আছে তারার মিছিল। সারা নগরী যেন নিথর, নিস্তব্ধ। কেবল খেজুর বাগানে দুষ্ট হাওয়ারা মাঝে মাঝে দোলা দিয়ে যায়।

দু'টি মানুষ বাড়ী থেকে বের হলেন। আঁধার মাড়িয়ে এগিয়ে চলেছেন তারা। প্রতিদিনই তারা এভাবে আঁধার মাড়ান। এটা তাদের নিত্যদিনের অভ্যাস। যান এ গলি। যান ঐ গলি। যান এ মহল্লায়। যান ঐ মহল্লায়। কিসের সন্ধানে ওরা নিশীথ রাতে ঘুরে বেড়ান?

হাটতে হাটতে ঘুরতে ঘুরতে পাড়া, মহল্লা দেখা শেষ হয়ে গেল। নাহ্। আজ তেমন কিছু চোখে পড়ছে না। আরো এগিয়ে গেলেন তারা। হাঁটতে

হাটতে তারা এসে পৌছুলেন 'হেরা' নামক স্থানে। আরবের খুব বিখ্যাত না হলেও পরিচিত স্থান।

দু'জন মানুষ ছায়ার মত এসে দাঁড়ালেন একটি বাড়ীর সামনে। এলাকার সবগুলো বাড়ীর আলো নেভানো। দু'একটি রাত জাগা প্রাণীর সাড়া শব্দ পাওয়া গেলেও মানুষেরা গভীর নিদ্রায় মগ্ন। দু'জনের চোখ স্থির হলো একটি বাড়ীতে।

ব্যাপার কি! সব বাড়ীর আলো নেভানো। অথচ এই বাড়ীতে আলো জ্বলছে? বয়স্কজন বললেন–

ঃ চলো দেখি গিয়ে কারণটা কি?

এত রাতে বাড়ীতে আলো জ্বলছে? কারণ জানার জন্য লোক দু'জন বাড়ীতে ঢুকলেন।

দূর থেকে দেখলেন।

একজন মহিলা।

সামনে জ্বলন্ত চূলা।

চূলার উপর হাড়ি।

মনে হয় কিছু রান্না করছে। কয়েকটা ছেলেমেয়ে পাশেই এলোমেলো শুয়ে আছে। মহিলার চোখ দিয়ে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু। ঘরের ক্ষীণ আলোতে তা টের পাওয়া যায়।

মহিলা রান্না করতে বসে কাঁদছে কেন?

এত রাতেই বা রান্না করছে কেন?

বয়স্ক লোকটি কারণ জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

নিজেদের আসার কথা জানান দিয়ে তাঁরা মহিলার সামনে গেলেন। মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন–

ঃ আপনি এত রাতে রান্না করছেন কেন?

ঃ আসলে আমি রান্না অনেক আগেই বসিয়েছি।

ঃ তাহলে?

ঃ কি বলবো। আসলে আমি রান্না করছি না। খালি হাড়িতে পানি দিয়ে জ্বাল দিচ্ছি। রান্নার ভান করছি। ছেলেমেয়েরা ভাববে তাদের জন্য আমি খাবার তৈরী করছি। এক সময় তারা ঘুমিয়ে পড়বে।

ঃ কেন? এমন করছেন কেন?

মহিলার বুকের ভেতর দুঃখের পাহাড় জমা হয়েই ছিল। প্রশ্ন শুনে তা আরো বেড়ে গেল। তবু নিজেকে সামলে নিয়ে জবাব দিলো–

ঃ আজ ঘরে ছেলেমেয়েদের খাওয়ানের মত কিছুই নেই।

ঃ কেনো, এদের পিতা?

ঃ তিনি কিছুদিন আগে জেহাদে শাহাদত বরণ করেছেন। সেই থেকে অতি কষ্টে দিন কাটাচ্ছি। জানি না শেষ পর্যন্ত কি হয়। হয়তো আমরা না খেয়েই মারা যাবো।

কথা শেষ করেই চোখ থেকে বন্যার পানির মত বেরিয়ে আসা অশ্রু মুছলেন আঁচল দিয়ে।

আগন্তুক প্রশ্নকর্তার ভেতরটা যেন মুচড় দিয়ে উঠলো। ভেতর থেকে যেন চিৎকার বেরিয়ে আসতে চাইলো। তিনি আর কথা বাড়ালেন না। সাথের লোকটিকে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেড়িয়ে গেলেন।

চলে এলেন বায়তুল মালে।

বায়তুল মাল থেকে নিলেন আটা আর প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী।

বাধলেন বোঝা।

তুলে নিলেন নিজের কাঁধে। সাথে সাথে ছুটে চললেন ঐ মহিলার বাড়ী অভিমুখে।

সাথের লোকটি বললো–

ঃ বোঝাটা আমার কাঁধে দিন। আমি বয়ে নিয়ে যাই।

জবাবে বয়স্ক লোকটি বললেন–

ঃ কিয়ামতের দিন তুমি আমার বোঝা বইতে পারবে না।

এই কথা বলে দু'জনে উপস্থিত হলেন মহিলার বাড়ী। খাদ্যদ্রব্য গুলো মহিলাকে দিলেন। আগন্তুক প্রশ্নকর্তা নিজেই খাবার তৈরী করলেন। মহিলার

ছেলেমেয়েদের খাওয়ালেন। এরপর বিদায় নিয়ে চলে এলেন। আর বলে এলেন পরদিন আমীরুল মোমেনীনের দরবারে যাওয়ার জন্য।

পরদিন যথাসময়ে মহিলা দরবারে পৌঁছুলো। দেখলো রাতের সেই খাবার দিয়ে আসা লোকটিই আমীরুল মোমেনীন স্বয়ং হযরত ওমর (রা)। মহিলা আমীরুল মোমেনীনের পায়ে লুটিয়ে পড়লো। বারবার ক্ষমা চাইতে লাগলো।

হযরত ওমর তখন পাল্টা মহিলার কাছে ক্ষমা চাইতে লাগলেন।

ঃ এতদিন আমি আপনার খবর রাখিনি। আপনিই বরং আমাকে মাফ করে দিন।

ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকদের এমন আদর্শই হওয়া উচিত। শাসক আর শাসিতের মধ্যে যেখানে কোন দূরত্বই থাকবে না।

মোমবাতিটা সরকারী

হযরত আলী (রাঃ) তখন খিলাফতের দায়িত্বে। সারাদিন রাষ্ট্রীয় নানান কাজে ব্যস্ত সময় কাটে তাঁর। তবু তাঁর কাজ শেষ হয় না। সকাল যায় দুপুর আসে। আবার দুপুর গড়িয়ে বিকেল। কাজের শেষ নেই। এরপর আসে রাত্রি। নাহ্। তাঁর কাজ শেষ হয় না। দিনের আলো শেষ হয়ে গেল। এখন অন্ধকার। দাপ্তরিক কাজ কিভাবে সারবেন তিনি? হ্যা, মোমবাতি তো আছে। সরকারী কাজে ফাঁকি দিলে চলবে না।

সামনে একপাশে একটা মোমবাতি জ্বালালেন তিনি। ক্ষীণ আলোয় কাজ করে চলেছেন হযরত আলী। এমন সময় ঘরে ঢুকলেন দু'জন গণ্যমান্য ব্যক্তি। একজন তালহা। অন্যজন জুবায়ের। তারা এসেছেন হযরত আলীর কাছ থেকে ব্যক্তিগত কিছু সুযোগ সুবিধা আদায়ের জন্য।

হযরত আলী তাদেরকে দেখেই দপ করে মোমবাতিটি নিভিয়ে দিলেন। অন্ধকারে হাতরে আরেকটি মোমবাতি বের করলেন তিনি। এরপর ওটাতে আগুন ধরালেন।

ব্যাপার কি? আমীরুল মোমেনীন এমন করলেন কেন? তাদের মনের কোণে প্রশ্ন উঁকি মারলো। কিছুটা অবাকও হলেন তারা। তারপরেই তাদের মনের কোণে উঁকি মারা প্রশ্নটা বেরিয়ে এলো।

ঃ কি ব্যাপার, আমীরুল মোমেনীন? একটা মোমবাতি নিভিয়ে আরেকটা মোমবাতি জ্বালালেন। এর ভেদ তো কিছুই বুঝতে পারলাম না?

ঃ দেখো, আগের মোমবাতিটা ছিল সরকারী তহ্‌বিলের। এতক্ষণ আমি সরকারী কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তাই ওই মোমবাতির আলো ব্যবহার করেছি। এখন তোমরা এসেছ। তোমাদের সাথে এখন আমার ব্যক্তিগত আলাপ হবে। তাই এই ব্যক্তিগত মোমবাতিটা জ্বালালাম। সরকারী মোমবাতি দিয়ে তো ব্যক্তিগত কাজ করা যায় না। তাই আমার নিজের পয়সায় কেনা মোমবাতিটা ধরালাম।

হযরত আলীর এই কথা শুনে আগন্তুক তালহা এবং জুবায়ের দু'জনই 'থ' হয়ে গেলেন। যাঁরা এসেছিলেন খলীফার কাছ থেকে কিছু সুযোগ সুবিধা পাওয়ার আশায়। তারা খলীফার এই কৃচ্ছ্রতা অবলম্বনের ঘটনা দেখে আর কিছুই বলার সাহস পেলেন না। নিজেদের আবদারের কথা বলা তো দূরের কথা।

দু'জনই নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। হযরত আলী আবার নিজের কাজে মনোযোগ দিলেন।

এমন শাসকই পৃথিবীতে দরকার। যিনি তাঁর আমানতের প্রতি সম্পূর্ণ সজাগ। আর সরকারী সম্পদ অপচয় রোধে সদা তৎপর।

মুগ্ধ পথিক

আরবের মরুময় রাস্তা। প্রখর তাপ ঠিকরে পড়ছে সূর্য থেকে। মাঝে মাঝে লু হাওয়া বালি উড়িয়ে ছুটে যায় কোন্ দিগন্তে। দু'জন পথিক হেটে চলছে সেই পথ ধরে। একজন মুসলিম। আর অন্যজন খ্রীস্টান। মুসলমান পথিক যাবেন কুফা নগরে। ইসলামী রাজ্যের রাজধানী কুফা। খ্রীস্টান পথিক যাবেন অন্যদিকে।

এক সাথেই চলছেন দুই পথিক। পথে চলতে চলতে দুই পথিকের মধ্যে আলাপ জমে উঠলো। হাটতে হাটতে দু'জনই এক চৌরাস্তায় এসে উপস্থিত। এই চৌরাস্তা থেকে একটা রাস্তা গেছে কুফার দিকে। আরেকটি গেছে অন্য দিকে। কথা শেষ করে খ্রীস্টান লোকটি অন্যদিকে তার গন্তব্যস্থলে যাত্রা করলো। হাটা শুরু করেই দেখলেন তার সাথের লোকটিও তার সাথে সাথে হেটে চলেছেন। খ্রীস্টান লোকটি অবাক হলো। ফিরে সহযাত্রীকে খ্রীস্টান লোকটি জিজ্ঞেস করলো–

ঃ কি ব্যাপার? আপনি না কুফায় যাবেন?

ঃ হ্যাঁ যাবো। জবাব দিল মুসলিম পথিক।

ঃ কিন্তু এদিকে হাটছেন কেন? এটা তো কুফায় যাবার পথ নয়। ঐ যে পথ দেখছেন ঐটা হলো কুফা যাবার পথ। আঙ্গুল দিয়ে পথটা দেখিয়ে দিল খ্রীস্টান লোকটি।

ঃ হ্যা, আমি জানি এটা কুফা যাবার পথ নয়। বলেই মৃদু হাসলেন মুসলিন পথিক।

ঃ তবু আপনার সাথে কিছুদূর যাবো। কারণ আমাদের মহানবী বলেছেন- কোন দু'জন লোক যদি এক সাথে কোথাও চলে তাহলে তাদের মধ্যে সহযাত্রীসূলভ দায়িত্ববোধ গড়ে উঠে। এতক্ষণ আপনি ছিলেন আমার পথযাত্রী। আমার সঙ্গী। এখন আমার কর্তব্য হলো আপনাকে বিদায় দেয়ার আগে কিছুদুর এগিয়ে দেয়া।

খ্রীস্টান লোকটি একথা শুনে আরো আশ্চর্য হয়ে গেল। বললো–

ঃ আপনাদের নবীর শিক্ষা যদি এই হয় তাহলে বলতেই হবে তিনি সত্য নবী। এখন বুঝতে পারছি তার ধর্ম ইসলাম কেন এত দ্রুত প্রসার লাভ করছে।

কথা শেষ হলো। দু'জনে দু'জনের কাছ থেকে বিদায় নিল। মুসলিম পথিক তার গন্তব্যস্থল কুফার দিকে। খ্রীস্টান পথিক চললো অন্যদিকে।

কিছুদিন পরের ঘটনা।

ঐ খ্রীস্টান পথিক কোন কাজে কুফা শহরে এলেন। এই শহরে তার কাজকর্ম সারার সময় একদিন ঘটনাক্রমে তার মুসলিম সহযাত্রীর সাথে দেখা হয়ে গেল। লোকেরা তাকে আমীরুল মোমেনীন বলছে। লোকটি ভাবনায় পড়লো। তাহলে আমার সহযাত্রীই মুসলমানদের খলীফা? ইনিই তাহলে খলীফা হযরত আলী ইবনে আবি তালিব? তার ব্যবহার এত মধুর? হযরত আলীর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে খ্রীস্টান ভদ্রলোক তখনই ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হলেন। তিনি হযরত আলীর একান্ত অনুসারী হয়ে প্রসিদ্ধ হয়ে ছিলেন।

বৃদ্ধের ভাতা

হযরত আলী (রা) এর রাজত্বকালে আরবে বাস করতো এক খ্রীস্টান। তরুণ বয়স থেকেই সে পরিশ্রম করে আয়-রোজগার করতো। সংসার চালাতো। এখন আর সেই বয়স নেই। বয়স বেড়েছে, হাত পায়ের শক্তি কমেছে। বলতে কি! বয়স হলে কত কি অসুখ-বিসুখ দেখা দেয়। কেউ কেউ তো পঙ্গু হয়ে যায়।

কিন্তু তার বেলায় তা হলো না। তবে একেবারেই যে হয়নি তা নয়। তার দুর্ভাগ্যই বলতে হবে। তার দু'টো চোখেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। একে তো বৃদ্ধ। তার উপরে দৃষ্টিশক্তিহীন। এখন বৃদ্ধের আয় রোজগারের কোন পথই নেই। দারুণ কষ্টে দিন কাটে তার। ঠিকমত খেতে পায়না সে। আর খাবে কোত্থেকে? তরুণ বয়সে সে তো কোন সঞ্চয় করেনি। তরুণ বয়সে সঞ্চয় করলে হয়তো তার এ দুর্দিনে কাজে লাগতো। তাছাড়া বৃদ্ধ বয়সে তাকে তো আর কেউ কাজ দেয় না।

তাই এই বৃদ্ধ বয়সে ভিক্ষা করা ছাড়া তার আর কোন পথই রইলো না। অগত্যা একদিন সে রাস্তায় বসলো।

একদিন সেই বৃদ্ধ রাস্তায় বসে ভিক্ষা করছে। হযরত আলী সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। বৃদ্ধকে ভিক্ষা করছে দেখে থমকে দাঁড়ালেন। আশেপাশের লোকজনকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন–

ঃ কি ব্যাপার? এই লোকটা ভিক্ষা করছে কেন?

লোকেরা বললো–

ঃ আমীরুল মোমেনীন, লোকটি খ্রীস্টান। সে কোন কাজ পায় না। তাই সে ভিক্ষা করছে।

ঃ কেন, তার সন্তানাদি কেউ নেই?

লোকেরা সবিনয়ে জানালো–

ঃ না জনাব। এই লোকটি তরুণ বয়সে বেশ কাজ করতে পারতো। তখন সে ভালো আয়-রোজগার করতো। সংসার চালাতো। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য এই লোকটি কিছুই সঞ্চয় করেনি। যা কামাই করতো সবই খরচ করে ফেলতো। যার ফলে এই শেষ বয়েসে বুড়োকে কত কষ্টই না করতে হচ্ছে। তাছাড়া সে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। তাই ভিক্ষা করা ছাড়া তার আর কোন পথ নেই।

লোকদের কথা শুনে হযরত আলী খুবই অবাক হলেন। তিনি লোকদেরকে বললেন–

ঃ কি আশ্চর্য! তোমরা এই লোকটার তরুণ বয়সের প্রশংসা করছো। তখন তোমরা তার কাছ থেকে কাজ আদায় করে নিয়েছ। সে ছিল তখন সমাজের সক্ষম ব্যক্তি। আর এখন সে এই বৃদ্ধ বয়সে অক্ষম হয়ে যাওয়ায় তোমরা তাকে এভাবে পরিত্যাগ করলে? তোমরা তার তারুণ্যের সময় তার সেবা নিয়েছ। আর এখন তার বিপদের সময় সে সেবা পাবে না, তা তো হতে পারেনা। সে যে এই ইসলামী রাষ্ট্রেরই নাগরিক। তোমরা সুস্থভাবে বেঁচে রয়েছো। তারও তো সুস্থভাবে বেঁচে থাকায় অধিকার রয়েছে। সে যে ধর্মের লোকই হোক না কেন?

তখনই হযরত আলী তার বায়তুল মালের লোকজনকে ডাকলেন। আর নির্দেশ দিলেন এই খ্রীস্টান বৃদ্ধের দুঃখ কষ্ট লাঘব করার জন্য আজীবন ভাতার ব্যবস্থা করতে।

দোষ তো আমার

পানি ভর্তি মশক নিয়ে হেটে যাচ্ছে এক মহিলা। পানির ভারে মহিলা বাঁকা হয়ে গেছে। তবু সে হেটে চলছে দ্রুত। পথে একজন ভদ্রলোক সামনে এসে দাঁড়ালো। মহিলা তাঁকে চেনে না।

ভদ্রলোকটি মহিলার কষ্ট দেখে বললেন–

ঃ এই যে মা, মনে হচ্ছে পানির ভারে খুব কষ্ট হচ্ছে। তোমার মশকটা আমাকে দাও। আমি তোমাকে বাড়ী পৌছে দিয়ে আসি।

আসলেই মহিলার খুব কষ্ট হচ্ছিল। লোকটির অনুরোধ শুনে মশকটি তার হাতে তুলে দিল। লোকটি পানির মশক কাঁধে ঝুলিয়ে মহিলার আগে আগে হাটতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরেই তারা মহিলার বাড়িতে এসে পৌছুল। লোকটি পানির মশক নামিয়ে নীচে রাখলেন। এরপর ঘাম মুছে বললেন–

ঃ মনে হয় তোমার পানি আনার বাড়ীতে আর কেউ নেই। ছেলেমেয়েদের বাবা কোথায়?

ঃ এদের বাবা নেই। উনি সৈনিক ছিলেন। হযরত আলী তাঁকে যুদ্ধ করার জন্য সীমান্তে পাঠিয়ে ছিলেন। ওখানেই তিনি শহীদ হয়েছেন। এখন আমি এই ছেলেমেয়ে নিয়ে অসহায়।

মহিলার কথা শুনে লোকটির চেহারার পরিবর্তন দেখা গেল। চোখের কোণে পানি চিক্‌চিক্‌ করে উঠলো। লোকটি কিছু না বলেই চুপচাপ মহিলার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বাড়ীতে পৌছুলেন তিনি। মনে তার ভীষণ দুঃখ। এক অসহায় মহিলা ও তার সন্তানদের কষ্ট দেখে তার খুব কষ্ট হলো। যন্ত্রণায় ছটফট করলেন তিনি। রাতে চিন্তায় তাঁর ঘুম হলো না।

নিয়ম মত ভোরেই তার এবাদত সারলেন। এরপর একটি ব্যাগে কিছু খেজুর আটা আর গোশ্‌তের কাবাব ভরে নিলেন। লোকটি ঐ ব্যাগ নিয়ে মহিলার বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। দরজায় আওয়াজ করলেন। ভেতর থেকে জবাব এলো–

ঃ কে?

ঃ মা দরজা খোল। আমি গতকালের সেই লোক। যে তোমার পানি বয়ে এনেছিলাম। এখন তোমার ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু খাবার নিয়ে এসেছি।

মহিলা দরজা খুলে দিলেন। লোকটি মহিলার হাতে ব্যাগটি তুলে দিলেন। মহিলা শুকরিয়া জানিয়ে ব্যাগটি হাতে নিয়ে বললো–

ঃ আল্লাহ্‌ আপনার মঙ্গল করুন। আর আমাদের খলীফা আলীর অবিচারের বিচার করুন। আর আপনি সত্যিই একজন ভালো লোক।

লোকটি বললেন–

ঃ আমি আরো কিছু কাজ করতে চাই। হয় আমি রুটি বানাই। নয় তো আমি বাচ্চাদের দেখি তুমি রুটি বানাও।

ঃ খুশি হলাম আপনার কথা শুনে। আমিই রুটি বানাবো। আপনি বরং বাচ্চাদের একটু দেখুন।

মহিলা রুটি বানাতে চলে গেল। লোকটি এই ফাঁকে সাথে নিয়ে আনা গোসতের কাবাব বাচ্চাদেরকে খেতে দিলেন। ছেলেমেয়েদের মুখে গোশ্‌ত দেবার সময় লোকটি বলতে থাকলেন–

ঃ বাছা, তোমরা আলীকে মাফ করে দাও। সে তোমাদেরকে ঠিকমত খোঁজ-খবর নিতে পারেনি।

এদিকে লোকটি বাচ্চাদেরকে আদর করে খাওয়াচ্ছেন। অন্যদিকে মহিলা রুটি বানাচ্ছে। এর মধ্যে মহিলা ডেকে বললো–

ঃ এই যে ভাই। আমার রুটি বানানো শেষ। আমার চুলাটায় আগুন জেলে দেবেন?

ঃ নিশ্চয়ই, এক্ষণি দিচ্ছি।

ভদ্রলোক চুলায় আগুন ধরাতে ব্যস্ত। এমন সময় মহিলার পাশের বাড়ীর এক মহিলা এসে উপস্থিত। ঐ মহিলা ভদ্রলোকটিকে দেখেই চমকে উঠলো। সে চিৎকার করে বিধবা মহিলাকে বললো–

ঃ তুমি তো ভীষণ অন্যায় করেছ? তুমি উনাকে চিনতে পারোনি? উনি তো আমাদের খলীফা! আমীরুল মোমেনীন হযরত আলী! প্রতিবেশী মহিলার কথা শুনে বিধবা মহিলা ভয় পেয়ে গেলো। লজ্জায় মাথা নুয়ে এলো তার। এরপর হাতজোড় করে ক্ষমা চাইল।

ঃ ছি! ছি! আমি একি করলাম। খলীফাকে এভাবে কষ্ট দিলাম। খোদার গজব নামুক। ভুল হয়ে গেছে আমীরুল মোমেনীন! আমাকে মাফ করে দিন।

ঃ না না। তুমি কেন মাফ চাইবে? দোষ তো আমার। আমাকে মাফ করে দাও। আমি তোমাদের ঠিকমত খোঁজ-খবর নিতে পারিনি। আমি দুঃখিত।

দুই মহিলা এক পাশে জড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হযরত আলী আরো কিছু কথা বলে বিদায় নিলেন।

আপেল কাড়া বাপ

খলীফা ওমর বিন আবদুল আজিজ তখন ইসলামী রাজ্যের শাসক। দামেস্ক হলো ইসলামী রাজ্যের রাজধানী।

খলীফার দরবার গৃহের কাছেই বায়তুলমালের গুদামঘর। প্রতিদিনই খলীফা ওমর বায়তুলমালের খোঁজ খবর নেন। আজো এসেছেন খোঁজ খবর নিতে। সাথে এসেছে খলীফার বালক পুত্র। বয়স খুব কম।

খলীফা ওমর বিন আবদুল আজিজ বায়তুলমালের বিভিন্ন বিভাগে ঘুরে ঘুরে দেখছেন। বালক পুত্রটিও পেছনে পেছনে হেটে হেটে দেখছে। বায়তুলমালে জমা হয়েছে সোনা, রুপা, বিভিন্ন ধরনের পশু। আর বিভিন্ন ধরনের ফল ফলাদি। সরকারী নির্দেশে জনগণ এসব জিনিসপত্র বায়তুলমালে জমা দিয়েছে।

ঘুরে ঘুরে খলীফা এসে দাঁড়ালেন আপেল ভাণ্ডারের সামনে। কোন এক বাগানের মালিক তার বাগানের পাকা পাকা বেশ কিছু আপেল আজই

বায়তুলমালে জমা দিয়েছে। খলীফা এগুলোর হিসাব ও অন্যান্য খোঁজখবর নিচ্ছেন রক্ষকের কাছ থেকে। এগুলো গরীব দুখিদের মাঝে বিতরণ করা হবে।

বায়তুলমালের কর্মীরা সুন্দর করে এসব আপেল সাজিয়ে রাখছে। থরে থরে সাজানো কয়েকটা তাক। তরতাজা আপেল। খুব সুন্দর লাগছে দেখতে। বাগান থেকে তুলে আনা একটা তাজা গন্ধ এখনো বাতাসে বইছে।

খলীফা তনয় এসে দাঁড়ালো আপেলের তাকের সামনে। কর্মীরা যে যার কাজে ব্যস্ত। খলীফাও ব্যস্ত তার নিজের কাজে। তিনি কিছুটা সামনে এগিয়ে গেছেন। খলীফা-তনয় এক নেত্রে চেয়ে আছে একটা পাকা আপেলের দিকে। সে দাঁড়িয়ে ভাবছে কতদিন ধরে সে আপেল খায় না। অথচ তার পিতা ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান। ইচ্ছা করলে দুনিয়ার সমস্ত আপেলই তিনি আনতে পারেন। তুলে দিতে পারেন নিজের ছেলেদের হাতে। আব্বুটা যে কি! যেদিন থেকে তিনি খলীফা হলেন সেদিন থেকে তাদের ঘরে সব ভালো ভালো খাবার বন্ধ হয়ে গেছে। অথচ আব্বুই নাকি দেশের সেরা ধনী ছিল। বালকটি এসব ভাবছে। আর ঐ লাল আপেলটার দিকে তাকাচ্ছে। এক ফাঁকে খলীফা-তনয় ঐ আপেলটি চুপিসারে তাক থেকে হাতে তুলে নিল।

গুদামের একজন রক্ষকের চোখে তা ধরা পড়লো। রক্ষক কিছুই বললো না। বলবেই বা কি। একটি মাত্র আপেল নিয়েছে বালকটি। তাছাড়া বালকটি যে খলীফার সন্তান। সে তো ইচ্ছা করলে অনেক আপেলই নিতে পারে। কিন্তু খলীফা যে কড়া। তার দ্বারা এটা সম্ভব নয়। রক্ষক বেচারা ভাবে যদি খলীফা তনয়কে এক ঝাপি আপেল দিতে পারতাম তাহলে কতই না ভালো হতো।

খলীফা বায়তুলমালের হিসাবপত্র দেখে গুদাম ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বালকটি তার আপেল নিয়ে খলীফার পেছনে পেছনে বেড়িয়ে এলো। ছেলের দিকে তাকাতেই খলীফার চোখে পড়লো ছেলের হাতে

আপেল। খলীফা খানিকটা ভাবলেন। তার চোখেমুখে কঠিন রেখা দেখা গেল। কিছু না বলেই ছেলের হাত থেকে মুহূর্তেই আপেলটি কেড়ে নিলেন তিনি। আপেলটা হাতে নিয়ে কি যেন ভাবলেন খলীফা। তারপরই গুদাম রক্ষকের হাতে আপেলটি ফেরত দিয়ে দিলেন। আর বললেন–

ঃ দেখো, খলীফার ছেলে বলে তাকে প্রশ্রয় দেয়া তোমাদের ঠিক নয়। এগুলো জনগণের সম্পদ।

গুদাম রক্ষক খলীফার চোখ রাঙানী দেখে কাচুমাচু হয়ে ভিতরে ঢুকে গেলো।

খলীফা তনয় ততক্ষণে কাঁদতে শুরু করেছে। এতটুকুন বালক। তার কি একটা আপেল খাবার ইচ্ছা জাগে না। সে কাঁদতে কাঁদতে মায়ের কাছে ছুটলো। খলীফা ফিরে দেখলো তার ছেলে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে যাচ্ছে। খলীফার চোখের পাতা পানিতে ভিজে উঠলো। কিছুই বলতে পারলেন না। শুধু ছুটে যাওয়া ছেলের দিকে চেয়ে থাকলেন।

ছেলে কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফিরলো। মা ফাতেমা তো ছেলেকে কাঁদতে দেখে বুকে টেনে নিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারেন যে ছেলে আপেলের জন্য কাঁদছে। ছেলের হাত থেকে খলীফা আপেল কেড়ে নিয়েছেন শুনে স্বামীর প্রতি কিছুটা রাগও হলো।

ফাতেমা ছেলের জন্য বাজার থেকে আপেল কিনে আনালেন। ছেলেকে দিলেন আপেল খেতে। খলীফা অন্যান্য কাজ সেরে বাড়ীতে ফিরলেন। দেখলেন ছেলেকে কোলে নিয়ে ফাতেমা আপেল খাওয়াচ্ছে।

খলীফা স্ত্রীকে বললেন–

ঃ তোমরা কি বায়তুলমালের আপেলে অংশ নিয়েছো?

ঃ না, জনাব। ছেলেকে কাঁদতে দেখে আমি বাজার থেকে কিনে আনিয়েছি। ফাতেমা নরমভাবে জবাব দিলেন।

খলীফা ফাতেমার কোল থেকে ছেলেকে নিজের কাছে টেনে নিলেন। নরম করে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন—

ঃ আল্লাহ্‌র কসম ফাতেমা। আমি ছেলেকে কাঁদাতে চাইনি। আমি যখন ছেলের হাত থেকে আপেলটা কেড়ে নিলাম, তখন আমার কলজেটা ছিড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু করবো কি বলো। এছাড়া তো আমার কোন উপায় ছিল না। এই একটি আপেলের জন্য আমাকে আল্লাহ্‌র কাঠগাড়ায় দাঁড়াতে হতো। আর এটা নিশ্চয় তুমি চাইতে পারো না।

ফাতেমার তখন দু'গণ্ড ভিজে গেছে চোখের পানিতে। স্বামীর প্রতি যে সামান্য অভিমান জমে উঠেছিল তা তার চোখের পানিতে ধুয়ে মুছে নিঃশেষ হয়ে গেলো।

খলীফার ভাঙ্গা ঘর

খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজের শাসন কাল। তখনকার ইরাকে একজন মহিলা বাস করতো। মহিলা ছিল বিধবা। তার ছিল পাঁচ মেয়ে। বহু কষ্টে সে এদের লালন-পালন করতো। দু'টি মেয়ে বড় হয়েছে। এদের বিয়ে দেয়া দরকার। কিন্তু বিয়ে দেবে, টাকা পয়সা কোথায়? বিয়েতে অনেক খরচপাতি। খরচের টাকা না থাকায় ওদের বিয়ে দিতে পারছে না মহিলা।

মহিলার স্বামী মারা যাবার আগে যা রেখে গিয়েছিল তাও এতিমদের লালন-পালন করতে গিয়ে ফুরিয়ে গেছে। এখন তাদের দুঃখের সীমা নেই। বহু কষ্টে দিন কাটে তার সন্তানদের নিয়ে।

তাদের দুঃখ কষ্টের কথা সবাই জানে। তাদের সাহায্য করার মত কোন আত্মীয়-স্বজনও নেই। পাড়া প্রতিবেশীরা তাকে বিভিন্ন পরামর্শ দিল। এসব তার পছন্দ হলো না। অথচ এখন ইসলামী রাষ্ট্র। এ সব দীন দুঃখীদের দেখার দায়িত্ব সরকারের। তাছাড়া মহিলা শুনেছে খলীফা নাকি খুবই ভালো লোক।

তাই সে খলীফা দ্বিতীয় ওমরের সাথে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিলো। ওমর ইবনে আবদুল আজিজকে দ্বিতীয় ওমর বলা হয়। খলীফার কাছে গিয়ে সে তার দুঃখ দৈন্যের কথা বলবে। কিন্তু বললেই তো আর যাওয়া যায় না। খলীফা থাকেন দামেস্কে। ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী দামেস্ক। কোথায় ইরাক আর কোথায় দামেস্ক।

তবু সে সিদ্ধান্তে অটল থাকলো। যে করেই হোক তাকে দামেস্ক পৌঁছুতে হবে এবং খলীফার সাথে দেখা করতে হবে।

মহিলা রওয়ানা হলেন দামেস্কে। একে তো মহিলা। দ্বিতীয়ত সে বয়স্কা। বহু কষ্ট করে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে তারপর একদিন গিয়ে পৌঁছুল দামেস্কে। লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করে খলীফার বাড়ী গিয়ে হাজির হলো মহিলা।

পুরানো একটা বাড়ী। ভাঙ্গাচুরা। হাটতে গেলে ভাঙ্গা সিড়িটা ঠক ঠক করে কাঁপে। মহিলা তো এসব দেখে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো। মহিলা নিজে নিজেই বলতে থাকলো–

ঃ হায় হায় আমি এসেছি খলীফাকে আমার দুঃখ-কষ্টের কথা বলে আমার ভাঙ্গা ঘর সাজাতে। এখন দেখি খলীফার ঘরই ভাঙ্গা। বৃথাই আমি এতদূর থেকে কষ্ট করে এলাম।

খলীফার স্ত্রী ফাতেমা দূর থেকে মহিলার কথাগুলো শুনে মহিলার কাছে এলেন। এসে মহিলাকে লক্ষ্য করে বললেন–

ঃ হ্যাঁ বোন, অসংখ্য ভাঙ্গা ঘর মেরামত করতে গিয়েই খলীফা নিজের ঘর মেরামত করার সময় পান না। এসো বোন, তোমার কষ্টের কথা শুনি।

ফাতেমার আদর মাখা কথায় মহিলার হতাশাটা কেটে গেল। দু'জনে বসে কথা বলতে থাকলো। মহিলা এতদূর থেকে এসেছে। সে খুব পরিশ্রান্ত। বসে কথা বলছে খলীফার বেগমের সাথে। এমন সময় দেখলো একজন সাধারণ গোছের লোক মশক দিয়ে পানি নিয়ে এলো।

প্রচণ্ড রোদ পড়ছে। তাপে মাটি যেন আগুন হয়ে উঠছে। তাই লোকটি মশক দিয়ে পানি এনে গরম মাটির উপর ছিটিয়ে দিচ্ছে। যাতে মাটির তাপটা কম লাগে। লোকটি পানি ছিটাচ্ছে। আর পবিত্র দৃষ্টিতে ফাতেমার দিকে তাকাচ্ছে। কয়েকবারই এমন হলো। বিধবা মহিলা তা দেখতে পেলো। বার বার এ রকম করছে দেখে মহিলা বললো–

ঃ আপনি লোকটিকে কিছু বলছেন না কেন? দেখছেন না কেমন বেহায়ার মত বার বার সে আপনার দিকে তাকাচ্ছে?

ফাতেমা তখনই হেসে ফেললেন। এরপর শান্তভাবে বললেন–

ঃ কেন তাঁকে তুমি চেনো না। তিনিই তো আমীরুল মোমেনীন। আমার প্রিয় স্বামী।

মহিলা কিছুটা লজ্জা পেলো। আবার ভীষণ অবাকও হলো। একজন খলীফা কাঁধে করে পানি আনে? উঠানে ছিটায়। এ যে অবিশ্বাস্য। খলীফা নিজের কাজ সেরে ঘরে গেলেন। ফাতিমাকে ডেকে মহিলার পরিচয় এবং তার অনেক অভিযোগের কথা শুনলেন।

আমীরুল মোমেনীন ইরাকের গর্ভনরের কাছে চিঠি লিখলেন মহিলার মেয়েদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করতে। মহিলা সেই চিঠি নিয়ে ইরাক রওনা হয়ে গেল।

আমাকে বাঁচাতে চান না?

খলীফা দ্বিতীয় ওমরের এক ফুফু বেড়াতে এসেছেন খলীফার বাড়ীতে। সারাদিন বসে থেকেও খলীফার দেখা পেলেন না ফুফু। খলীফা সারাদিন কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাই বাড়ীতে ফেরেননি। বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা হলো। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত। তবু আসছেন না। খলীফার বেগম ফাতেমা বার বার ফুফুকে প্রবোধ দিচ্ছেন। আরেকটু অপেক্ষা করুন তিনি চলে আসবেন। ফুফু তার ভাইপো খলীফার পথ চেয়ে বসে রইলেন।

খলীফা তার অফিসের কাজকর্ম এবং ব্যক্তিগত কাজ শেষ করে তারপর বাড়ী ফিরলেন। বাড়ীতে ফিরে অন্যান্য কাজ সেরে খেতে বসলেন। ফাতেমা তার ফুফু আসার কথা তাঁকে জানালেন। এমন সময় ফুফু এসে উপস্থিত।

খলীফা ওমর খেতে বসেছেন। তার সামনে রয়েছে মাত্র দু' দুটো রুটি। একটু লবন ও সামান্য তেল। ফুফু খলীফার এই খাবারের আয়োজন দেখে অবাক হলেন। ফুফু এই নিম্ন মানের খাবারের ব্যবস্থা দেখে বললেন–

ঃ আমি এসেছিলাম কিছু অভাব-অভিযোগের কথা বলতে। এখন দেখি তোমার অভাবের কথাই আমাকে আগে বলতে হবে।

খলীফা ফুফুর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছেন আর আপন মনে খাচ্ছেন। ফুফু আবার বললেন–

ঃ তুমি একজন খলীফা। তোমার এ ধরণের খাবার শোভা পায় না।

খলীফা মৃদু হেসে বললেন–

ঃ কি করবো ফুফু আম্মা। এরচে ভালো খাবারের ব্যবস্থা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অন্যায় পথে না গিয়ে যদি ভালো খাবারের ব্যবস্থা করতে পারতাম, তাহলে তা করতাম। জনগণকে বঞ্চিত করে হয়তো সম্ভব। কিন্তু আমার দ্বারা তো তা করা সম্ভব নয়।

এরপর ফুফু অনেক কথা বললেন। অনুযোগ, আবদার করলেন। শেষে বললেন–

ঃ তুমি অনেকের ভাতা কম করে দিয়েছ। অথচ সেসব তুমি দান করনি।

খলীফা এবার শক্ত হলেন। একটু অন্যভাবে বললেন

–যা সত্য ও ন্যায় আমি তাই করেছি।

এরপর খলীফা একটি দিনার, একটি আগুনের পাত্র ও এক টুকরো গোস্‌ত আনালেন। ঐ আগুনে দিনারটিকে খুব করে গরম করলেন। যখন প্রচণ্ড গরমে দিনারটি লাল হয়ে উঠলো, তখন খলীফা শিক দিয়ে ধরে দিনারটিকে গোস্‌তের টুকরার উপর চেপে ধরলেন। গোস্‌তটা স্যাঁৎ করে জ্বলে উঠলো এবং পুড়ে গেলো।

ফুফু এতক্ষণ ভাইপো খলীফার কাণ্ড দেখছিলেন। আর অবাক হচ্ছিলেন। খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ গোশ্‌তের টুকরার দিকে ইশারা করে বললেন–

ঃ ফুফু আম্মা! আপনি কি আপনার ভাইপোকে এরূপ কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচাতে চান না?

ফুফু সব বুঝতে পারলেন। লজ্জিতও হলেন। আসলে তার কথাই তো ঠিক। হারাম খেয়ে মাংশ বাড়ালে সে মাংশ দোজখের আগুনে জ্বলবে।

ফুফু আর কথা বাড়ালেন না। মাথা নিচু করে খলীফার কাছ থেকে চলে এলেন।

খেদমতগার

জগত খ্যাত খলীফা ছিলেন বাগদাদের খলীফা হারুন আল রশীদ। তার মত তার ছেলেও জগত খ্যাত শাসক হয়েছিলেন। তার নাম খলীফা মামুনুর রশীদ। খলীফা মামুন ছিলেন খুবই অতিথি পরায়ণ।

একবার মামুনুর রশীদের বাড়ীতে এক মেহমান বেড়াতে এলেন। খব নামী দামী মেহমান। নাম তার ইয়াহইয়া। খুবই জ্ঞানী ব্যক্তি। তখনকার দিনের বড় জ্ঞান সাধক। বেড়াতে এসেছেন রাতের বেলা। মামুন দরবারের কাজকর্ম সেরে মেহমানের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করছেন। মামুন শাসক। আর মেহমান জ্ঞানী। দু'জন আলাপ করছে। কত বিষয় তাদের আলোচনায় আসছে। দেখতে দেখতে রাত গভীর থেকে গভীরতর হলো। ঘরের বিভিন্ন কোণে জ্বলছে মোমবাতির মিষ্টি মিহিন আলো।

সমুদ্রের যেমন শেষ নেই। তাদের জ্ঞানগর্ভ আলোচনারও তেমনি শেষ নেই। একবার জ্ঞানী লোকের কাছে বসতে পারলে এ বিষয়টা ভালোভাবে

বুঝা যায়। খলীফা মামুনও এমনই এক জ্ঞানী মেহমান পেয়ে তার সঙ্গ থেকে উঠতে চাইছেন না।

দু'একটি মোমবাতি জ্বলে জ্বলে নিঃশেষ হয়ে গেল। মশালচী এসে আবার নতুন মোম জ্বালিয়ে দিয়ে চলে গেল। তাদের আলাপ-আলোচনা আর ফুরায় না। এক সময় অতিথির গলা ধরে এলো। এদিক ওদিক কয়েকবার তাকালেন মেহমান। কি যেন খুঁজছেন তিনি।

খলীফা মামুনের দৃষ্টিতে তা এড়ালো না। তিনি বুঝতে পারলেন নিশ্চয় অতিথি কিছু খুঁজছেন। তা না হলে এদিক ওদিক তাকাবেন কেন?

খলীফাও বার কয়েক এদিক ওদিক তাকিয়ে মেহমানকে লক্ষ্য করে বললেন–

ঃ আপনি কি কিছু খুঁজছেন?

ঃ না, মানে আমার খুব তৃষ্ণা পেয়েছে।

ঃ ও বুঝতে পেরেছি। বলেই খলীফা মামুন উঠে চললেন পানি আনতে। মেহমান ইয়াহইয়া শশ ব্যস্ত হয়ে বিনয়ের সাথে বললেন–

ঃ আপনি উঠলেন কেন? কোন ভৃত্যকে ডাকলেই কি হতো না?

ঃ তাতে কি? আমি খলীফা বলেই কি আপনি এ কথা বলছেন? খলীফার পানি আনতে দোষ কি? রাসূলুল্লাহ (সা) স্বয়ং বলে গেছেন–জাতির প্রধান ব্যক্তি জনগণের সাধারণ খাদেম মাত্র।

এ কথা বলে খলীফা মামুন পানি আনতে চলে গেলেন। মেহমান ইয়াহইয়া খলীফার কথার কোন জবাব দিতে পারলেন না। আর জবাবই বা দেবেন কি? তিনি তো সত্য কথাই স্মরণ করিয়ে দিলেন। মেহমান খলীফা কে তার কাজের জন্য বাধা দিতে পারলেন না।

রাসূলের আদর্শের প্রতি খলীফা মামুনের অকৃত্রিম ভালোবাসা আর দরদ দেখে মেহমানের মনেও রাসূলের প্রতি শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার আলো জ্বলে উঠলো।

সত্যিকারের শাসকদের এই হলো আদর্শ। বিশাল সাম্রাজ্যের মালিক হয়েও যারা নিজেকে শাসক মনে করেন না। মনে করেন নিজেকে গোলাম, দাস, ভৃত্য আর খাদেম।

দরিদ্র এক বাদশা

রাজা বাদশাদের কোন কিছুর অভাব থাকে? থাকে না। লোকে বলে না 'রাজার চাল-চলন' মানে তার কোনকিছুর অভাব নেই। দুঃখ কষ্ট তাকে ছুইতেই পারে না। বিলাস বিভবে তার দিন কেটে যায় অনায়াসেই। ডাকলেই পেয়ে যান হাজার খাদেম। হাজার লোক।

কিন্তু আমি এমন এক রাজার কথা বলছি-যিনি রাজা হয়েও চলতেন সাধারণ লোকের মত। বিশাল রাজ্যের মালিক তিনি। তবু তার অভাব দূর হয় না। তার মানে তিনি কি সম্পদের পাহাড় পেয়েও আরো সম্পদ চান? না। তা নয়। সম্পদ যা আছে ওগুলো তো তার নয়। ও গুলোতো রাষ্ট্রের সম্পদ। জনগণের সম্পদ। চাইলেই তিনি তা খরচ করতে পারেন না।

রাজা। তবু তার অভাব মেটেনা। এ কেমন কথা? হ্যাঁ সত্যিই তার অভাব মেটেনা। তিনি তার অভাব দূর করার জন্য টুপি সেলাই করেন। কাপড় সেলাই করেন। আর নিজ হাতে লিখেন পবিত্র কুরআনের কপি। এসব করে যা আয় হয় তা দিয়েই তিনি তার সংসার চালান।

আর যিনি রাণী। তিনিও কি কম? তিনিও নিজ হাতে ঘরের সব কাজকর্ম করেন। রান্না করেন। ঘর দোর মুছেন। সব নিজেই করেন। একবার রাণী তার নিজের কাজ করছিলেন। মানে রান্না করছিলেন। যেহেতু কাজের লোক নেই। তাই নিজেই রান্না করছিলেন। চুলায় রান্না বসালেন রাণী। আটা গুলে তা দিয়ে রুটি বানিয়ে চুলায় সেকে তা খাবার উপযোগী করছেন।

কিন্তু একটা দু'টা রুটি সেকা হবার পরই হঠাৎ রাণীর হাত গরম চুলায় লেগে গেল। গরম চুলা বুঝতেই পারছো। লাগা মাত্রই রাণীর হাত পুড়ে গেল। খুব কষ্ট পেলেন রাণী।

পোড়া হাত নিয়ে রাণী এলেন রাজার কাছে। হাতটা তার ভেজা কাপড় দিয়ে বাঁধা। রাজা তখন তার নিজের কাজে ব্যস্ত। হঠাৎ দেখলেন রাণী তার বিষন্নভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ব্যস্ত হয়ে রাজা জিজ্ঞেস করলেন–

ঃ কি হয়েছে বেগম। এমন বিষন্ন দেখাচ্ছে যে?

রাণী তখন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন–

ঃ কি আর হবে। হাতটা পুড়ে গেছে। একলা আর কুলিয়ে উঠতে পারছিনে। একজন কাজের মেয়ে ঠিক করে দিন।

রাণীর কষ্টের ব্যাপারটা রাজা বুঝতে পারলেন। রাণীর কষ্টটা যেন রাজার বুকের মধ্যেও এসে জমা হলো। রাজার চোখে টলমল করে উঠলো কষ্টের পানি। তিনি রাণীকে বললেন–

ঃ তোমার কষ্টটা বুঝি বেগম। কিন্তু কি করবো বলো। আমার তো কাজের মেয়ে রাখার সঙ্গতি নেই। ধৈর্য ধরে কাজ করে যাও বেগম। আল্লাহ তার পুরস্কার দেবেন। আমার যা ধন-সম্পদ–এগুলো জনসাধারণের। আমি তার রক্ষক মাত্র। অপ্রয়োজনীয় ব্যয় করে রাজ্যের ব্যয়ভার বৃদ্ধি করতে পারবো না।

বলে রাজা রাণীকে তার কাজে পাঠিয়ে দিলেন। এতক্ষণ যে রাজার কথা বললাম। তিনি দিল্লীর বাদশা নাসির উদ্দিন। যিনি বাদশাহ আল তামাসের পুত্র ছিলেন। দিল্লীর বাদশা হয়েও তিনি এমন কষ্ট করে নিজের জীবিকা নির্বাহ করতেন।

জনগণের জন্য যাদের হৃদয় পাগলপারা
শাসক হয়েও কষ্ট করে দিন কাটালেন তারা।

সোনার গাঁর সোনার মানুষ

তোমরা সোনার গাঁর নাম শুনেছ নিশ্চয়ই। এই সোনার গাঁ ছিল এক সময় বাংলাদেশের রাজধানী। তখন বাংলাদেশের কোন অভাব ছিল না। সোনার গাঁ যেন সোনা দিয়েই ভরপুর ছিল। এই সোনার গাঁয়ের এক স্বাধীন সুলতান ছিল। নাম তার গিয়াস উদ্দীন আযম শাহ্। তারই একটি গল্প বলবো তোমাদেরকে।

গিয়াস উদ্দীন প্রায়ই প্রজাদের সুখ-দুঃখ নিজ চোখে দেখার জন্য রাজধানীর বাইরে যেতেন।

একবার তিনি ফজরের নামাজের পর বেরিয়েছেন। পরনে তার সাধারণ আল খাল্লাহ্ আর পাজামা। সাথে আছেন মন্ত্রী ইয়াহ্ইয়া।

দু'জনে ঘুরে ফিরে বিভিন্ন এলাকা দেখলেন। প্রজাদের খোঁজ-খবর নিলেন। দেখতে দেখতে অনেক বেলা হয়ে গেল। এখন তারা রাজধানীতে ফিরবেন।

কিন্তু পথিমধ্যে তাদের ভীষণ পিপাসা পেল। কিন্তু পানি পাবেন কোথায়। মন্ত্রীর পরামর্শে তারা উভয়েই পাশের গ্রামের এক গৃহস্থের বাড়ীতে গিয়ে উঠলেন।

মন্ত্রী গৃহস্থের বাড়ীর উঠানে গিয়ে খাবার পানি চাইলেন। গৃহস্থ লোকটি তখন ছেলেপেলে নিয়ে দুপুরের খাবার খেতে বসেছে। সে দেখলো দু'জন পথিক তার বাড়ীতে এসে পানি চাইছে। সে ভাবলো ভীনদেশী কোন মুসাফির হবে। তাই সে তাদেরকে বসতে কাঠের পিঁড়ি দিল। সে ভাবলো ওরা যখন ভীনদেশী মুসাফির তখন শুধু পানি দিয়ে আপ্যায়ণ করা ঠিক হবে না। তাই সে ঘরে রান্না করা খুদের জাউ এনে তাদের সামনে দিয়ে বললো–

ঃ আপনারা ভীনদেশী মানুষ। ক্ষুধায় হয়তো কষ্ট পাচ্ছেন। শুধু পানি দিয়ে আপনাদের সমাদর করা ঠিক হবে না। আমার ঘরে আজ খুদের জাউ রান্না হয়েছে। দয়া করে এগুলো খেলে আপনাদের ক্ষুধা কিছুটা মিটবে।

সুলতান গিয়াস উদ্দীন তৃপ্তিভরে পানি খেলেন। তারপর লোকটিকে বললেন–

ঃ আচ্ছা আপনার ঘরে খুদের জাউ রান্না হয়েছে কেন? ঘরে কি চাল নেই?

ঃ কি করবো বলুন। এবারের বন্যায় ফসলের খুব ক্ষতি হয়েছে। তাই কষ্ট করে এসব খেয়েই বেঁচে আছি আমি। গৃহস্থ লোকটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো।

গিয়াস উদ্দীন তখন বললেন–

ঃ আপনাদের সুলতানের কথা শুনেননি?

ঃ শুনেছি।

ঃ তিনি নাকি প্রজাদের জন্য অনেক চাল জমা করে রেখেছেন। সুলতানের কাছ গেলে তো কিছু আনতে পারতেন।

ঃ আনতে তো পারতাম। কিন্তু অনেক দূরের পথ বলে আর খোঁজ–খবর নেওয়া হয়নি। বললো গৃহস্থ লোকটি।

ঃ বলেন কি? আপনাদের জন্যই সুলতান এ চাল জমা করে রেখেছেন। কালই আপনি যাবেন। আর যারা অভাবগ্রস্থ আছে তাদেরও যেতে বলবেন। ওসব আপনাদেরই। সুলতান তো মাত্র রক্ষক।

এ কথা বলেই সুলতান ও তার মন্ত্রী গৃহস্থের দেয়া খুঁদের জাউ খেলেন। খেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে তারপর রাজধানীতে রওনা হলেন।

পরদিন সকাল বেলায় গৃহস্থ লোকটি সুলতান গিয়াস উদ্দীনের দরবারে গিয়ে উপস্থিত হলো। দেখলো সিংহাসনে বসা গতকালের সেই ভীনদেশী মুসাফির লোকটি। আর পাশে বসে আছে তার সঙ্গী লোকটি। গৃহস্থ লোকটির আর বুঝতে বাকী রইলো না যে গতকালের ভীনদেশী মুসাফিরটি আসলে মুসাফির ছিলেন না। ছদ্মবেশে গিয়েছিলেন সুলতান গিয়াস উদ্দীন নিজেই।

গৃহস্থ তখন বিস্ময়ে হতবাক। তার বিস্মতার ঘোর কাটে না। সে ...নের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে রইলো। এরপর একবার এদিক ...র ওদিক দেখে সোজা সুলতান গিয়াস উদ্দীনের পায়ে গিয়ে আর বলতে থাকলো–

...ুর! আমি তো আপনাকে চিনতে না পেরে গতকাল বড় অন্যায় করে ...। আমাকে মাফ করে দিন। বলেই পা জড়িয়ে ধরলো সে ...রে।

...য়াস উদ্দীন তখন বসা থেকে উঠে গৃহস্থ লোকটিকে উঠিয়ে দাঁড় ...বললেন–

...ই আমারই উচিত ছিল আপনার হাল হকিকত জানা। অন্যায় তো ...আমি আমার দায়িত্ব ঠিকমত পালন করতে পারিনি। আমি আমার ...ঠিকমত পালন করতে পারিনি বলে আমিই আপনার কাছে ক্ষমা ...পনি আমাকে মাফ করে দিন।

সুলতান গৃহস্থ লোকটিকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। গৃহস্থ খুশীতে ...হয়ে গেল। এমন সোনার মানুষ তাকে জড়িয়ে ধরেছে। তার ...ক দুর্বল দেহে যেন নতুন করে প্রাণ সঞ্চার হলো। বুকটা তার

নতুন বলে বলিয়ান হয়ে উঠলো। সুলতানের ব্যবহারে তার যে অভাব কষ্ট ছিল তা যেন দূর হয়ে গেল।

এরপর সুলতান তার গুদাম রক্ষককে নির্দেশ দিলেন এই গৃহস্থকে তার প্রয়োজন মত ধান চাল দিতে।

গৃহস্থ লোকটি গুদাম ঘর থেকে তার প্রয়োজন মত ধান চাল নিয়ে সুলতান গিয়াস উদ্দীনের প্রশংসা করতে করতে তার বাড়ী ফিরে গেলো।

সমাপ্ত